সম্পাদকীয়

মহররম মাস কেবলই মাতম করতে নয় বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষা দেয়

মহররম মাস আসলেই কারবালার সেই দুঃসহ স্মৃতিতে প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। সেই নৃশংস ঘটনা যখন ঘটে, মুসলিম জাহানে তখন চলছিল চরম অরাজকতা। ইসলামের চার খলীফার স্বর্ণযুগ তখন অতীত। রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লালসার কাছে সমর্পিত হয় আদল ও ইনসাফ। প্রিয় নবীর (সা.) দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এই অন্যায় মেনে নিতে পারে নাই। ন্যায় ও সত্যের পতাকা সমুন্নত রাখবার লক্ষ্যে সুদৃঢ় শপথ নিয়ে তিনি এজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সেই যুদ্ধ ছিল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এজিদ যুদ্ধের সকল রীতিনীতি ভঙ্গ করে হত্যা উৎসবে মেতে উঠে। সত্যের পথে অসীম সাহসী বীর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং তাঁর স্বজন ও সহযোদ্ধারা মৃত্যু অবধারিত জেনেও আপোসহীন যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। এজিদ বাহিনী ফোরাতের তীর অবরুদ্ধ করে দিনের পর দিন এক বিন্দু পানিও পান করতে না দিয়ে ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর সহযোদ্ধাদের নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে। পিপাসায় কাতর হয়ে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু ইসলামের মহান শিক্ষা ও ঈমানের পথ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হন নাই।

এই শোককে আত্মস্থ করে ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ইবাদত-বন্দেগীর নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ন্যায় প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে অসীম সাহসের সাথে আপোসহীন লড়াই করে কিভাবে প্রয়োজনে আত্মবিসর্জন দিতে হয়, সেই শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা থেকে। আজ সারা পৃথিবী লোভ ও হিংসার আগুনে জ্বলছে। মানবতা আজ বিপন্ন।

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) সম্প্রতি তাঁর এক জুমুআর খুতবায় শিয়া-সুন্নিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "মুসলমান সে যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ" তাহলে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, হত্যাকান্ড ও যুলুম নির্যাতন বন্ধ হয়ে প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসার মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হবার কথা। আজ সকল মুসলমান যদি কলেমা এবং দরূদের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ নেতৃত্বের আওতাধীন হয়ে যায় তবে তারা বহু বিপদাবলী থেকে রক্ষা করতে পারে।

১৫ জানুয়ারী ২০০৯

সূচী পত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** — ৪
- **হাদীস শরীফ** — ৫
- **অমৃত বাণী** — ৬
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** — ৭-১২
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **হযরত মৌলভী নূরুউদ্দীন (রা.)-এর হিজরত** — ১৩-১৫
  মূলঃ মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.)
  অনুবাদ : মাওলানা ফিরোজ আলম
- **ঈসা সদৃশ নবী** — ১৬-১৮
  সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী
- **ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)** — ১৯-২১
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর**
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল — ২২-২৫
- **সংবাদ** — ২৭-২৯
- **কৃষি পাতা** — ৩০

প্রচ্ছদ : তারেক আহমদ (সবুজ)

আমরা দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি যে, আজ যুগ মসীহকে না মানার ফলেই মহররম মাসেও দেখা যায় মসজিদে পর্যন্ত জুতা ছোড়াছুড়ির মত জঘন্যতম দৃশ্য। সমাজ থেকে সকল অপকর্ম বিলুপ্ত হোক, ন্যায়ের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে সকল অন্যায় ও অশান্তি থেকে। আর কারবালার মহান আদর্শে আমরা উজ্জীবিত হই এটাই কাম্য।

নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের বর্বর হামলার প্রতিবাদে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো এখনও নীরব কেন?

গত কয়েক দিন ধরে গাজায় ইসরায়েলিরা যে ভয়াবহ নারকীয় তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে তা কি বন্ধ হবার নয়? আর কত নিরীহ মানুষের প্রাণ তারা চায়? কোন দোষে গাজায় নিরীহ-নিষ্পাপ লোকদের ওপর এই বর্বরোচিত হামলা? যদিও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার বিভিন্ন শহর ও নগরে ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস সদস্যদের সন্ধানে ঘরে ঘরে হামলা চালাচ্ছে কিন্তু এই হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে শত শত নিরীহ জনগণ। দেখা যায় একজনের বিপরীতে এক-দেড়'শ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। এই নারকীয় তাণ্ডবলীলার জন্য ইসরাইলে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা কেবল খোদাই ভালো জানেন।

(সম্পাদকীয়-র বাকী অংশ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কুরআন শরীফ

সূরা হূদ-১১

২৯। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমি যদি এক সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে থাকি এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে যদি এক কৃপায় ভূষিত করে থাকেন এবং তা তোমাদের অগোচরে রয়ে গিয়ে থাকে তবে তোমরা এ (সুস্পষ্ট প্রমাণ) অপছন্দ করা সত্ত্বেও কি আমরা তা মানতে তোমাদের বাধ্য করতে পারি?

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ
وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ
اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। আর হে আমার জাতি! এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন ধনসম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে আমি কখনো তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু আমি তোমাদের এক অজ্ঞতাপ্রদর্শনকারী জাতিরূপে দেখতে পাচ্ছি।

وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا
عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا
رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। আর হে আমার জাতি! আমি তাদের তাড়িয়ে দিলে আল্লাহ্‌র (হাত থেকে) রক্ষা করতে কে আমাকে সাহায্য করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। আর আমি তোমাদের এ কথা বলি না, 'আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভান্ডার আছে এবং আমি অদৃশ্য সম্পর্কে জানি।' আর আমি এ কথাও বলি না, 'আমি একজন ফিরিশ্‌তা।' আর তোমরা যাদের হেয় দৃষ্টিতে দেখ তাদের সম্পর্কে আমি একথা বলি না, 'আল্লাহ্‌ কখনো তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না।' তাদের মনের কথা আল্লাহ্‌ সবচেয়ে ভাল জানেন। আমি (যদি তোমাদের মতই বলি) সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমি যালেম বলে গণ্য হবো।

وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ
تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

হাদীস শরীফ

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ***"আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে"*** (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্তা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্তা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

শোন! খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন। যারা নিজেদেরকে আহলে বায়আতের অনুসারী বলে দাবী করে এবং শিয়া বলে পরিচয় দেয়, তাদের কিছু লোক প্রথম সারির সাহাবা, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কয়েকজন খলীফা এবং উম্মতের কয়েকজন ইমাম সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলে। মতামত প্রকাশ ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এরা বাড়াবাড়ি করে ফেলে। এরা তাঁদেরকে কাফের ও যিন্দিক (অর্থৎ রাষ্ট্রদ্রোহী সশস্ত্র মুরতাদ-অনুবাদক) আখ্যা দেয়, তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যায় আত্মসাৎ, যুলুম ও ভ্রষ্টতার অপবাদ আরোপ করে। এরা আজ পর্যন্ত এ থেকে বিরত হয় নি আর এদের অপপ্রচারও বন্ধ হয় নি। আসলে এরা বিরত হবার পাত্রও নয়। বরং তাঁদের গালি দিয়ে এরা আনন্দ পায়। এরা উত্তেজিত হলেই এ ঘৃণ্য রীতি অনুসরণ করে আর একে একটি মহান পুণ্যকর্ম বলে মনে করে, বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ বলে মনে করে। এরা তাঁদের অভিসম্পাত দিয়ে মনে করে বড় ভাল কাজ করেছে এবং এর প্রতিদানে বড় বড় পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করে। নিজেদের অপকর্মকে এরা সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম, খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায় এবং ধার্মিকদের মুক্তির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। আমি কিছুকাল এদের মাঝে কাটিয়েছি। আমার প্রভু আমার জন্য প্রতিটি পরীক্ষাকে সহজ করেছেন। এ বিষয়ে তারা যা গোপন করতো আমি অতি ভয়ে-ভয়ে কিন্তু সযত্নে তা দেখতাম আর তাদের প্রতারণার সব মাধ্যমকে বিশ্লেষণ করতাম। তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে আল্লাহ্ তাআলা আমার ভাগ্যে তাদেরই একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে রেখেছিলেন। আমি তাদের মধ্যে দিবারাত্র সময় কাটিয়েছি এবং তাদের সাথে বার বার বিতর্ক করেছি। তাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াদি আমার অজানা থাকার কথা নয়। আমার অভিজ্ঞতা হলো, তারা এমন একটি দল যারা প্রথম সারির সাহাবিদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং সন্দেহের পর্দায় আবৃত থাকতে পছন্দ করে। তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কথায় কথায় শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও উমর)-কে দোষারোপ করা এবং তাঁদের পবিত্র চেহারায় কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। তারা মানুষের সামনে কখনো কেরতাসের কাহিনী আর কখনো ফেদকের বিতন্ডার দিকে ইঙ্গিত করে এবং এর সাথে তাদের মিথ্যার বেসাতি তো আছেই।

(পুস্তক : 'সির্‌রুল খিলাফাহ্' বাংলা সংস্করণ, পৃ: ১৭)

ইংরেজি নববর্ষ সবার জন্য অশেষ কল্যাণ বয়ে আনুক

বহি: শত্রুরা ইসলামের ওপর মারাত্মক হামলা করছে, এমতাবস্থায় আমাদের খোদার দরবারে সমর্পিত থাকা উচিত

বর্তমানে ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে, সঠিক নির্দেশনা না থাকার কারণে নির্যাতিত ফিলিস্তিনিরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে

বিশ্বের চলমান অশান্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের জন্য বেশি বেশি দোয়া এবং দরূদ পাঠ করুন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

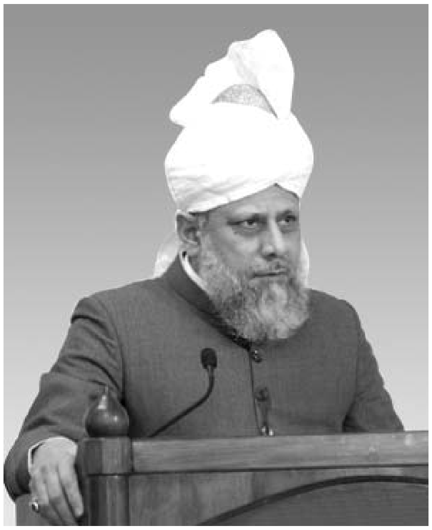

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ২ জানুয়ারী ২০০৯ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ]

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই:) বলেন, বর্তমানে আমরা মহররম মাস অতিক্রম করছি। ঘটনাক্রমে আজ চান্দ্র এবং খ্রীষ্ট উভয় পঞ্জিকার প্রথম জুমুআ। আজকের এই জুমুআ জামাতের জন্য অশেষ কল্যাণ বয়ে আনুক। এ উপলক্ষে আমি দোয়ার প্রতি জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

জামাতের বিভিন্ন বই-পুস্তক, মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর গ্রন্থাবলীতে এবং আমি নিজেও বহুবার বলেছি যে, জুমুআর দিনের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর যুগের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। একেতো এ যুগে বস্তুবাদীতার কারণে মুসলমানদের জীবন থেকে জুমুআর গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইবাদতের প্রতি এবং বিশেষভাবে সূরা আল্ জুমুআয় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমরা জাগতিকতার মোহে অন্ধ হয়ো না বরং সর্বদা স্মরণ রেখো যে, সকল কল্যাণের উৎস হচ্ছেন খোদা তা'লা। তাই জুমুআর নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করো আর যখন নামায শেষ হয় তখন স্বানন্দে তোমরা জাগতিক কাজ কর্মে ব্যাপৃত হও এবং আল্লাহ্‌র করুণা অন্বেষণ করো। এই সূরার প্রারম্ভে আখারীনদের (শেষ যুগের লোক) মধ্য থেকে মহানবী (সা:)-এর নিষ্ঠাবান দাস ও প্রেমিকের আবির্ভূত হবার শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি মহানবী (সা:)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবেন অর্থাৎ তাঁর মিশনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখাই তাঁর দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শিক্ষার প্রসার এবং মানুষের আত্মসুদ্ধি বা পবিত্র করার দায়িত্ব নিয়েই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। যেন বিশ্ববাসী আপন স্রষ্টা খোদাকে চিনতে পারে এবং সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা এক জাতিসত্তায় পরিণত হয়। আর অন্যান্য জাতির মানুষও যেন একহাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) এ প্রসঙ্গে একস্থানে বলেন, **'মহানবী (সা:)-এর আবির্ভাবের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মকে পরিপূর্ণ করা। এটি দু'পর্যায়ে পূর্ণতা পাবে এক, তকমীলে হেদায়াত (শিক্ষার চরমোৎকর্ষ) এবং অন্যটি হচ্ছে, তকমীলে ইশায়াতে হেদায়াত (শিক্ষা পুরোপুরি প্রচার-প্রসার)। মহানবী (সা:)-এর নিজের যুগটি হচ্ছে তকমীলে হেদায়াতের যুগ এবং তকমীলে ইশায়াতে হেদায়াতের যুগ হচ্ছে তাঁর দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ যখন**

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

এর যুগ আসবে। এবং সেই সময়টি হচ্ছে এখন অর্থাৎ আমার যুগ, (হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর যুগ)।' তকমীলে হেদায়াত এবং তকমীলে ইশায়াতে হেদায়াত এর যুগের সম্মিলিত হওয়াও এক মহান জুমুআ। তকমীলে হেদায়াত এর অর্থ হচ্ছে মহানবী (সা:)-এর আবির্ভাবের সাথে সকল নিয়ামতরাজি চরমোৎকর্ষে পৌঁছে গেছে তা জাগতিক বা আধ্যাত্মিকই হোক না কেন। এখন কামেল ধর্ম ইসলামের পর নতুন কোন ধর্ম বা শরীয়তের প্রয়োজন নেই। কেউ এ প্রশ্ন উঠাতে পারে যে, মহানবী (সা:)-এর যুগে জাগতিক নিয়ামতরাজি পরম পরাকাষ্ঠা লাভ করেনি বরং এখনও প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন আবিষ্কারাদী সামনে আসছে। একথা তাদের কাছে সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, মহানবী (সা:)-ই পরিপূর্ণ এবং কামেল নবী। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা গোটা বিশ্বের সকল মানবের জন্য আবির্ভূত করেছেন এবং তাঁর যুগকে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। তাঁর প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো, এ গ্রন্থে অতীত ইতিহাসের পাশাপাশি ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিভিন্ন শুভসংবাদের সমাহার ঘটেছে। অধুনা বিশ্বে যেসব নিত্য নতুন আবিষ্কারাদী হচ্ছে তার সংবাদও আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই এ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আজ নব আবিষ্কাররূপে যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি পবিত্র কুরআনে কোন না কোন ভাবে এর সমর্থন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা যদি এর প্রতি মনোযোগ দেন এবং পবিত্র কুরআনের আলোকে তাদের গবেষণা কর্ম চালিয়ে যান তাহলে তাঁদের গবেষণার অনেক খোরাক তাঁরা এখান থেকে লাভ করতে পারবেন। আমাদের ড. প্রফেসর আব্দুস সালাম সাহেবও পবিত্র কুরআন থেকে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে নিজ গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেছেন। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে এমন প্রায় সাতশত আয়াত আছে যা কোন না কোনভাবে বিজ্ঞানের সাথে যোগসূত্র রাখে বা এমন আয়াত পাওয়া যায় যদ্বারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। যদি এখনও আহমদী বিজ্ঞানীরা পবিত্র কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন বা এই মহা সমুদ্রে অবগাহন করেন তাহলে হতে পারে যে, তারা হয়ত আরও অধিক মনি-মুক্তা এতে খুঁজে পাবেন। যাইহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, মহানবী (সা:)-এর যুগেই 'শিক্ষা' পরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সে যুগে অনেক কিছুই পর্দার অন্তরালে ছিল ফলে মানুষ তা অনুধাবন করতে পারে নি কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর যুগে নিত্য-নতুন আবিষ্কারাদীর কল্যাণে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু নতুন জিনিষ উদ্ভাবিত হচ্ছে এবং এসকল উপকরণ 'সত্য' প্রচারের কাজকে বেগবান করছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এসব নতুন আবিষ্কারাদী যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জামাতের প্রচার-প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁর গ্রন্থাবলীতে এসব কিছুর উদাহরণ দিয়েছেন। সুতরাং মহানবী (সা:)-এর সত্যিকার দাস বা প্রেমিকের যুগে এমন এমন জিনিষ উদ্ভাবিত হচ্ছে যার কল্যাণে ধর্মের প্রচার ও প্রসার কাজে অনেক গতি সৃষ্টি হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা:)-এর অনন্য শিক্ষা আর তাঁর সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এমনসব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি হচ্ছে যা একজন মু'মিনের বিশ্বাস এবং ইমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করছে। এসব দেখে মহানবী (সা:)-এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় হৃদয় ভরে যায় আর মানুষ দরূদ পাঠের প্রেরণা পায়; আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

বর্তমানে ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও সঠিক নির্দেশনা না থাকার কারণে নির্যাতিত ফিলিস্তিনিরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। তারা নিজেরাই নিজেদের দুর্দশার জন্য দায়ী। এ যুগ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, ধর্মের নামে কোন যুদ্ধ হবে না। ধর্মের নামে কেউ যুদ্ধ করলে সে ব্যর্থই হবে। আর এমনিতেই এই যুদ্ধে কোন ভারসাম্য নেই। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত যাতে নিরীহ এবং বেসামরিক লোকজন মারা না যায়। ইসরাইল নিরীহ লোকদের উপর আক্রমন করছে, যদিও তারা কোন কোন লক্ষ্যেও আঘাত হানছে কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষ মারা পড়ছে। এখানকার পত্র-পত্রিকাতেও ব্যাপক লেখালেখি হচ্ছে যে, একজনের বিপরীতে তোমরা শ' দেড়'শ মানুষকে হত্যা করছ। তাদের সাথে খোদা কি ব্যবহার করবেন বা তাদের কি পরিণতি হবে তা খোদার তকদীর স্বয়ং সিদ্ধান্ত করবে আর কুরআন থেকে এটিই বুঝা যায়। অতএব ফিলিস্তিনিদের জন্য যদি কিছু করতে চান তাহলে মুসলমানদের উচিত হবে খোদার দরবারে বিনত হওয়া এবং তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করা। খোদা তা'লা অত্যাচারীকে যে শাস্তি দেবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানদের উচিত যুগ ইমামের আহবানে সাড়া দেয়া এবং যুগ ইমামকে শনাক্ত করা।

হুযূর বলেন, আমি পূর্বেও বলেছি যে, ইংরেজী নববর্ষের আজ প্রথম জুমুআ আর আরবী পঞ্জিকারও আজ প্রথম জুমুআ। আমি একথাও বলেছি যে, জুমুআর সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর যুগের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দু'টি ক্যালেন্ডারেরই প্রথম জুমুআর সম্মিলন ঘটেছে তাই দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। সৌর বছরের সূচনা হয় সিজারের যুগে এবং তা পরবর্তীতে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার নামে পরিচিতি লাভ করে। চান্দ্রমাস হলো ইসলামী মাস কিন্তু চান্দ্র ও সৌর উভয় ব্যবস্থাপনাই খোদা কর্তৃক সৃষ্ট। হযর?ত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর তিরোধানের পর তাঁর খিলাফতের দ্বিতীয় শতাব্দীতে চান্দ্র এবং সৌর উভয় পঞ্জিকার জুমুআ একত্রিত হলো। আমরা যদি সঠিকভাবে কাজ করি আর দোয়া করি তাহলে এটি ইহ ও পরকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর সাথে যুক্ত সকল কল্যাণে আমাদেরকে ভূষিত করবে। চান্দ্র ও সৌর মাসের প্রথম জুমুআ একটি আশিসপূর্ণ দিনে মিলিত হওয়া অবশ্যই কল্যাণকর। এটি আহমদীয়াতের জন্যও সর্বৈব কল্যাণ বয়ে আনুক।

হুযূর বলেন, আজ গোটা বিশ্ব যেখানে ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত সেখানে সারা বিশ্বের আহমদীদের নোংরা পানিতে নিমজ্জিত মানবতাকে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে বিধৌত করতে হবে। নতুবা আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বলে পরিগণিত হতে পারিনা আর মোহাম্মদী মসীহ্র হাওয়ারীও গণ্য হবোনা এবং যারা ইতিপূর্বে نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ 'র ধ্বনী উচ্চকিত করেছেন তাদেরও অন্তর্ভূক্ত হবো না। এটি আমাদের একটি গুরুদায়িত্ব। খোদা তা'লা মানুষের কাছ থেকে কেবল পরীক্ষাই নেন না কখনও কখনও কিছু ব্যতিক্রমধর্মী এবং অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করেন ফলে মানুষের ইমান সতেজ হয়। আর প্রতিটি পরীক্ষার পর মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পরীক্ষার সময় নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন আবশ্যক। অধিক সচেতনতার সাথে কাজ করতে হবে যাতে খোদা কর্তৃক নির্ধারিত বিজয় তরান্বিত হয়। আজ আরবী এবং ইংরেজী নববর্ষের এই প্রথম জুমুআতে আমি সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, আপনারা নিজেদের মাঝে একটি পবিত্র পরিবর্তন সাধন করুন। বেশি বেশি দোয়া করুন এবং এমন বেদনাভরা হৃদয় নিয়ে দোয়া করুন যাতে আমাদের দোয়া কবুল করত: মহানবী (সা:)-এর পতাকা সমগ্র বিশ্বে উড্ডীন রাখার দৃশ্য খোদা তা'লা আমাদেরকে দেখান। দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলছি, বেশি বেশি দরূদ পাঠ করুন। মহানবী (সা:)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) দরূদ পাঠের গুরুত্ব এবং ফযিলত সম্পর্কে অনেক স্থানে লিখেছেন। আমাদেরকে অবিরত দরূদ পাঠ করতে হবে। কিন্তু দরূদ পাঠ করার পূর্বে মহানবী (সা:)-এর প্রকৃত মর্যাদার কিছুটা জ্ঞান ও নিজের আধ্যাত্মিক মানকে উন্নত করা আবশ্যক। একটি হাদীসে হযরত আবু তালহা (রা:) আনসারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, **'একদিন প্রভাতে মহানবী (সা:) যখন আমাদের সামনে আসেন তখন তাঁর চেহারা বিশেষভাবে প্রফুল্ল ছিল। সাহাবীগণ (রা:) জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্র রসূল! আজ আপনার পবিত্র চেহারায় আনন্দের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে; উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক ফিরিশ্তা এসে আমাকে বলেছে, তোমার উম্মতের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি একবার যথযথভাবে তোমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে দশটি নেকী বা পুণ্য প্রদান করবেন, তার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন আর তার পদমর্যাদা দশ ধাপ উন্নত করবেন এবং অনুরূপ রহমত তার প্রতি বর্ষণ করবেন যেভাবে সে তোমার জন্য দরূদ পাঠ করেছে।'** এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, আমাদের প্রিয় নবী (সা:) তাঁর উম্মতের ক্ষমালাভ ও পদমর্যাদার উন্নতি দেখে যারপর নাই আনন্দিত ছিলেন। তাই আমাদের দায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে দরূদ পাঠ করা আর এর কল্যাণে পাপ মুক্তি এবং নেকী করার সৌভাগ্য লাভ করা আর ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিত করা। আরেকটি হাদীসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) বর্ণনা করেন যে, **'মহানবী (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে কিয়ামত দিবসে আমি তাঁর শাফা'য়াত করবো।'** এ দু'টো হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, দরূদ পাঠ করার বদৌলতে প্রথমে পদমর্যাদা উন্নত হবে তারপর তিনি (সা:)-এর শাফা'য়াত লাভ করবে।

হুযূর বলেন, যে ব্যক্তি সত্যিকারেই বুঝে-শুনে মহানবী (সা:)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে সে অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে আপন হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ লালন করতে পারে কি? তাঁর আল্ বা বংশধর এবং সাহাবীদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করতে পারি কি? এই হাদীসের প্রতি মনোযোগ দিলে আজ ধর্মের নামে যেসব ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানি হচ্ছে তা দূর হতে পারে। মহানবী (সা:)-এর উম্মত সম্পর্কে খোদা বলেন যে,

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

(সূরা আল্ ফাত্হ:৩০) অর্থ: 'তারা

পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত’ কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আজকের তথাকথিত রসূল প্রেমিরা মুখে দরূদ পাঠ করে ঠিকই কিন্তু তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দের লক্ষণ আদৌ নেই বরং তারা বহুধা বিভক্ত। এখন মহররম মাস, এ মাসে মুসলমানরা পরস্পরের রক্ত নিয়ে হুলি খেলায় মত্ত। পাকিস্তানে বড় বড় নামধারী আলেম-উলামা রসূলের মিম্বরে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা:)-এর অনুপম শিক্ষা প্রদানের পরিবর্তে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ছড়ায়, মানুষকে হিংসাত্মক কর্মের জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করে। এরা শান্তির দূত না হয়ে ঘৃণার দূত হিসেবে কাজ করে। এজন্য সরকার বাধ্য হয়ে এদের চলাফিরার উপর প্রত্যেক বছর এ দিনগুলোতে বিধিনিষেধ আরোপ করে যে, অমুক-অমুক মৌলভী অমুক-অমুক স্থানে যেতে পারবে না কারণ এরা বিষোদগার করা ছাড়া আর কিছুই জানেনা আর সহিংসতা ছাড়া অন্য কিছু শিখায় না। প্রতি বছরই পাকিস্তানে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটে ফলে অনেক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। কারবালায় শিয়া-সুন্নি পরস্পরের উপর আক্রমন করে। প্রশাসন মৌলভীদের নিয়ে শান্তি কমিটি বানাতে বাধ্য হয়। ফলে মহররমের দিন ভালোয় ভালোয় কাটলেও পরে এদের হৃদয় থেকে ঘৃণার লাভা উদগীরিত হয়। প্রচুর হানাহানির সংবাদ পাওয়া যায়। বাহ্যত দরূদ পাঠ করলেও এরা এমন জঘণ্য কাজ করে বেড়ায় যা অবিশ্বাস্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের দরূদ পাঠকারীদের জন্য মহানবী (সা:) শাফা'য়াত করবেন কি?

হুযূর বলেন, আমাদের আহমদীদেরকে অধিকহারে দরূদ পাঠ করতে হবে আর বিশ্বের চলমান অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে হবে। যারা মহানবী (সা:)-এর আধ্যাত্মিক আত্মীয়-পরিজন তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ বাজে বা আপত্তিকর উক্তি করার কথা একজন মুসলমান ভাবতেও পারে না। আমাদের প্রিয় নবীর জীবন রক্ষায় যারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আর বুক পেতে তাঁকে আগলে রেখেছেন দরূদ পাঠের সময় তাদের পবিত্র চেহারা আমাদের চোখে ভাসতে থাকে। যাদের একজন কঠিনতম মূহূর্তে সাথী হিসেবে গুহায় তাঁর সাথে অবস্থান করেছেন, যার সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ বলেছেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

অর্থ: দু:খ করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। খোদা তা'লা স্বয়ং তাঁকে মহানবী (সা:)-এর পবিত্র সাথী আখ্যায়িত করেছেন; এতদসত্ত্বেও এমন পবিত্রচেতা বুযুর্গদের বিরুদ্ধে অবমানননাকর কথা বলতে এদের হৃদয় কাঁপে না। সকল মুসলমানই মহানবী (সা:)-এর আল্ বা বংশধরদের জন্য দোয়া করেন আর এ দোয়াতে কেবল তাঁর রক্তসম্পর্কের বংশধররাই নয় বরং যারা তাঁর সাথে আধ্যাত্মিকতার বন্ধনে আবদ্ধ তারাও অন্তর্ভূক্ত। আজ তাঁরা কেউই এসব নামধারী মুসলমানদের আক্রোশ এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। আপনারা সত্যিকার ভালবাসার প্রেরণা নিয়ে দরূদ পাঠ করুন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **‘একবার ইলহাম হয় যার অর্থ হচ্ছে, আরশে ফিরিশ্তারা মতবিনিময় করছিল যে, ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্য খোদার ইচ্ছা প্রবল কিন্তু এখনও খোদার দরবারে সংস্কারক নির্ধারিত হয়নি এজন্য তারা মতভেদ করছে। এ সময় স্বপ্নে দেখলাম যে, ফিরিশ্তারা একজন সংস্কারককে খুঁজে ফিরছে। তখন এক ব্যক্তি এই অধমের সামনে আসেন এবং ইঙ্গিতে তিনি বলেন, হাযা রাজুলুন ইউহিব্বু রাসূলাল্লাহি অর্থাৎ, এই সেই ব্যক্তি যিনি রসূলুল্লাহ্‌কে ভালবাসেন। এবং এ কথার অর্থ ছিল, এই পদের জন্য প্রধান শর্ত হচ্ছে, রসূলের প্রতি ভালবাসা; যা এই ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। একইভাবে উপরোক্ত ইলহামে রসূলের বংশধরদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করার যে নির্দেশ রয়েছে এর রহস্য হলো, ঐশী জ্যোতি থেকে কল্যাণ মন্ডিত হবার জন্য আহলে বায়তকে গভীরভাবে ভালবাসার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হন তিনি সেইসব পুণ্যাত্মাদের উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং সকল জ্ঞান ও মা'রেফতের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন। এ স্থলে একটি খুবই প্রাঞ্জল কাশ্‌ফের কথা মনে পড়ছে আর তা হলো, একদা মাগরিবের নামাযের পর একেবারে জাগ্রত অবস্থায় সামান্য তন্দ্রাভাব হয় যা হালকা নেশাতুল্য ছিল। তখন বিস্ময়কর পরিস্থিতির অবতারণা হয়, প্রথমে একবার কয়েকজনের খুব দ্রুত আসার শব্দ পাই, দ্রুত হাটার সময় যেভাবে জুতো এবং মুজার শব্দ হয়। তারপর ঠিক সে সময় পাঁচজন সুদর্শন সম্মানিত মানুষ সামনে এসে যান অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা:), হযরত আলী (রা:), হযরত হাসান ও হুসাইন (রা:) এবং ফাতেমা (রা:)। উনাদের মধ্য থেকে একজন এবং যতটা মনে পড়ছে যে, হযরত ফাতেমা (রা:) একান্ত স্নেহ এবং ভালবাসার সাথে মমতাময়ী মায়ের মত এই অধমের মাথা তাঁর ঊরুর উপর রাখেন। এরপর আমাকে একটি গ্রন্থ প্রদান করা হয়। যার সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি কুরআনের তফসীর যা আলী (রা:) রচনা করেছেন। এখন আলী (রা:) সেই তফসীর তোমাকে দিচ্ছেন,**

ফালহামদুলিল্লাহি আলা যালিক (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র)।' (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড-পৃষ্ঠা:৫৯৮-৫৯৯ টীকা-পাদটীকা-নাম্বার:৩)

হুযূর বলেন, অনেকে এই ইলহাম বিকৃত করে বলে যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ:) ফাতেমার (রা:) অবমাননা করেছেন। এটি মূলত তাদের নোংরা চিন্তাধারার বহি:প্রকাশ। বিশৃংখলা পরায়ণ মৌলভীরা এই কাশ্‌ফের পুরো শব্দাবলী তুলে ধরেনা বরং আংশিক কথা বলে মানুষকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে আর মানুষও যাচাই-বাছাই না করেই মোল্লাদের অন্ধ অনুকরণ করে। মোল্লারা বাকীসব কথা বাদ দিয়ে বলে, মির্যা সাহেবের মাথা নাকি ফাতেমার ঊরুতে রেখেছেন। অথচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর ইলহামে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, তিনি পরম মমতাময়ী মায়ের মত আমার মাথা তাঁর ঊরুতে রেখেছেন! মায়ের ব্যাপারে কেউ নোংরা কোন চিন্তা করতে পারে কি? হ্যাঁ কেবল এ ধরনের মোল্লারাই এমন নোংরা ও কদর্য চিন্তা করতে পারে। অথচ এই ইলহামে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা:)-এর প্রতি অগাধ ভালবাসা ও ভক্তির কারণে মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর উন্নত পদমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। খোদার নৈকট্য লাভ করার জন্য সেইসব পবিত্র ও নিষ্পাপ লোকদের নৈকট্য পাওয়া এবং তাদের উত্তরাধিকার পাওয়া আবশ্যক আর খোদার প্রেমাস্পদ ও প্রিয়দের ভালবাসা পাওয়া প্রয়োজন। এটি যদি মোল্লারা বুঝতো তাহলে আজ মুসলমানদের মাঝে এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের দেয়াল দাঁড় করাতো না। এ ধরনের মোল্লারা নিজেদের মনগড়া এসব হীন ও ঘৃণ্য অপকর্ম করতে গিয়ে খোদার পুণ্যবান বান্দাদের দুর্নাম করে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে বিবেক খাটাতে হবে। মহানবী (সা:) খোদার ভালবাসা পাবার জন্য যেসব দোয়া শিখিয়েছেন তাতে খোদার নৈকট্যের পাশাপাশি পুণ্যবানদের ভালবাসা পাবার জন্যও দোয়া রয়েছে। একটি দোয়া হলো,

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ

(সুনানে তিরমিযী-বাব:আবওয়াবুদ্ দাওয়াত) অর্থ: 'হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার ভালবাসা দাও এবং আমার হৃদয়ে সেই ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করো যার ভালবাসা তোমার সন্নিধানে আমার কাজে আসবে।'

রসূলের ভালবাসাই সবার কাজে আসবে। আমাদের দায়িত্ব তাঁর নির্দেশ মান্য করা আর তিনি যাদেরকে ভালবাসতেন তাদেরকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা। অগণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি (সা:) যেভাবে তাঁর আপন আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসতেন সেভাবে তাঁর মান্যকারী আধ্যাত্মিক বংশরূপী সাহাবীদেরকেও ভালবাসতেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা:) বলেন, **'যারা তাঁর ভালবাসার পাত্রের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করবে খোদা তা'লা তাদের প্রতি রহমত করবেন।'** কেবল প্রথম যুগের সাহাবারাই এ শ্রেণীভূক্ত নন বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল রসূল প্রেমিকের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা:) ভালবাসার উপদেশ দিয়ে গেছেন। আজ মুসলমানরা যদি এই রহস্যটি বুঝে তাহলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে না। কখনও পরস্পরের মসজিদে আত্মঘাতি বোমা হামলা করতে পারে না। মুসলমানদের চিন্তা করা উচিত যে, আজ কি কারণে এসব হচ্ছে। একটি যুগ ছিল যখন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এবং মমত্ববোধ পরিদৃষ্ট হতো। কিন্তু আজ সর্বত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে শুধু ঘৃণার বিষবাস্প ছড়ানো হচ্ছে। কি হয়েছে তোমাদের? কার ক্রোধের দৃষ্টি পড়েছে তোমাদের উপর? কোথায় তোমরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছ, তা একটু চিন্তা করে দেখো! তোমাদের দুর্বলতা কোথায় তা খুঁজে বের করো।

অতএব আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্য দোয়া করে যাওয়া। আমি পুনরায় আহমদীদের বলছি, আপনারা এ মাসে অজস্রধারায় দরূদ শরীফ পাঠ করুন এবং উম্মতে মুসলেমার মধ্য হতে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীভূত হবার জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন। মহানবী (সা:) এবং সে সকল মানুষ যাদেরকে তিনি ভালবাসতেন তাদের এমনভাবে ভালবাসুন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। মসীহ্ মওউদ (আ:) হযরত হুসাইন (রা:) সম্পর্কে বলেন, **'হযরত হুসাইন (রা:) পবিত্রকারী ও পবিত্র ছিলেন এবং নি:সন্দেহে সেইসব মনোনীত লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যাদেরকে খোদা তা'লা নিজ হাতে পবিত্র করেছেন। স্বীয় ভালবাসায় খোদা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছেন। নি:সন্দেহে তিনি বেহেশ্‌তের সর্দারদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর প্রতি বিন্দু পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমান হারানোর কারণ। তাঁর ঈমান, খোদার প্রতি ভালবাসা, ধৈর্য্য, ত্বাকওয়া, দৃঢ়চিত্ততা, খোদাভীতি ও ইবাদতের মান আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। সে হৃদয় ধ্বংসপ্রাপ্ত যে তাঁর প্রতি শত্রুতা রাখে। আর সফলকাম সেই হৃদয় যা কার্যত তাঁর**

প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে।' অতএব প্রত্যেক আহমদীকে হযরত হুসাইন (রা:)-এর প্রতি এমনই ভালবাসা পোষণ করা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ:) হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উসমান এবং হযরত উমর (রা:)-এর জন্য আমাদের হৃদয়ে ভালবাসা সঞ্চার করেছেন একইভাবে সাহাবীদের পদমর্যাদা সম্পর্কেও আমাদের মাঝে সচেতনতা রয়েছে। অতএব রসূলের প্রতি যাদের ভালবাসা রয়েছে তাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে ভালবাসা থাকা আবশ্যক। সাহাবীদের পদমর্যাদার কথা বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) একস্থানে বলেন, **'সাহাবায়ে কেরাম খোদা এবং তাঁর রসূল (সা:)-এর খাতিরে এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন যে কারণে তাদেরকে 'রাযিআল্লাহ্ আনহুম ওয়া রাযু আনহুম' এর শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে।'** এটি সেই মহান মর্যাদা যা সাহাবাগণ লাভ করেছেন। খোদা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট, এই শুভ সংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **'তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় আদম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের প্রতিচ্ছবি। তিনি নবী ছিলেন না সত্যি কিন্তু তাঁর মধ্যে নবী এবং রসূলের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এবং আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল।'**

আরেকটি হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন, **'শয়তান উমরের ছায়া দেখলেও পলায়ন করে'** অন্য আর একটি হাদীসে তিনি (সা:) বলেন, **'আমার পর যদি কেউ নবী হবার থাকতো তাহলে উমর (রা:) নবী হতো।'** অন্যত্র এসেছে, **'পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতে অনেকেই মোহ-দ্দিসের পদমর্যাদা লাভ করেছেন আর এই উম্মতের মধ্যে যদি কেউ মোহাদ্দিস থেকে থাকেন তিনি হলেন উমর (রা:)।'**

হুযূর বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে রসূলের সব প্রিয়ভাজনই একান্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়। আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুসলেমাকে সকল মতভেদ ভুলে যাবার তৌফিক দিন। আজ বহি:শত্রুরা ইসলামের উপর চরম আক্রমন হানছে, এমতাবস্থায় আমাদেরকে খোদার দরবারে সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও সঠিক নির্দেশনা না থাকার কারণে নির্যাতিত ফিলিস্তিনিরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। তারা নিজেরাই নিজেদের দুর্দশার জন্য দায়ী। এ যুগ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, ধর্মের নামে কোন যুদ্ধ হবে না। ধর্মের নামে কেউ যুদ্ধ করলে সে ব্যর্থই হবে। আর এমনিতেই এই যুদ্ধে কোন ভারসাম্য নেই। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত যাতে নিরীহ এবং বেসামরিক লোকজন মারা না যায়। ইসরাইল নিরীহ লোকদের উপর আক্রমন করছে, যদিও তারা কোন কোন লক্ষ্যেও আঘাত হানছে কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষ মারা পড়ছে। এখানকার পত্র-পত্রিকাতেও ব্যাপক লেখালেখি হচ্ছে যে, একজনের বিপরীতে তোমরা শ' দেড়'শ মানুষকে হত্যা করছ। তাদের সাথে খোদা কি ব্যবহার করবেন বা তাদের কি পরিণতি হবে তা খোদার তকদীর স্বয়ং সিদ্ধান্ত করবে আর কুরআন থেকে এটিই বুঝা যায়। অতএব ফিলিস্তিনিদের জন্য যদি কিছু করতে চান তাহলে মুসলমানদের উচিত হবে খোদার দরবারে বিনত হওয়া এবং তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করা। খোদা তা'লা অত্যাচারীকে যে শাস্তি দেবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানদের উচিত যুগ ইমামের আহবানে সাড়া দেয়া এবং যুগ ইমামকে শনাক্ত করা। আমি যখনই এখানে অমুসলিমদের সামনে বলার সুযোগ পেয়েছি তাদেরকে বলেছি যে, যদি তোমরা মানুষের প্রতি ইনসাফ বা সুবিচার না করো তাহলে নিজেদেরকে ভয়াবহ যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবে। নিরীহ লোকদের উপর যুলুম করে তোমরা কখনই রেহাই পাবে না। এদেরকে সবসময় একথাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা এবং ইনসাফের দাবী সমুন্নত রাখো। খোদা করুন যাতে এই বড় বড় পরাশক্তিগুলো সুবিচারের দাবী মোতাবেক কাজ করে নতুবা এটি একটি বা দু'টি দেশের যুদ্ধের ব্যাপার নয় বরং বিশ্বজনীন ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে, বর্তমান পরিস্থিতিও এ কথাই বলছে।

হুযূর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বেশি বেশি দোয়া এবং দরূদ পাঠ করার তৌফিক দিন যেন এই পৃথিবীকে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। খোদা করুন পৃথিবীবাসী যেন এই বাস্তবতা অনুধাবন করে এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই নতুন বছর জামাতে আহমদীয়ার জন্য সহস্র সহস্র রহমত ও বরকত বয়ে আনুক। আমরা যেন খোদার অপার কৃপায় নিত্য-নতুন সফলতার সোপান মাড়াতে পারি। সকল অর্থে এই নতুন বছর আহমদীদের জন্য বয়ে আনুক প্রভূত কল্যাণ, আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

হযরত মৌলভী নূরুউদ্দীন (রা.)-এর হিজরত

মূল ঃ মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রাঃ)
অনুবাদ ঃ মাওলানা ফিরোজ আলম

[আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক "হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)" থেকে অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হচ্ছে। পাঠক বৃন্দ সম্পূর্ণ পুস্তকটি পাঠে অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমরা আশা করছি]

মৌলভী নূরউদ্দীন আরও তিন বছর মহারাজার চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। সে কাজে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন আর কাজ পরিবর্তনের কোন কারণ দেখছিলেন না। বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র হতে থাকে। কিন্তু যতদিন তাঁর উপর মহারাজার আস্থা ছিলো অন্যকিছু নিয়ে তাঁর চিন্তা হতো না।

১৮৯২ সনে রাজা সুরুজ কাউল রাজ্যপরিষদের সিনিয়র পারিষদ ছিলেন। কিছুদিন ধরে তিনি কিডনির ব্যথায় ভুগছিলেন এবং তিনি চাইলেন যেন মৌলভী নূরউদ্দীন তাঁর চিকিৎসা করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি কিডনিতে পাথর চিহ্নিত করে তাঁকে যথাযথ পরামর্শ দিলেন। রোগী অত্যন্ত ক্ষেপে যান এবং বলেন, "আপনি কি জানেন না, আমার অধীনে সাত জন ইউরোপি-য়ান ডাঃ কাজ করছেন?"

(তিনি বললেন) "এর সাথে কিডনীর পাথরের কোন সম্পর্ক নেই।"

"তাছাড়া আমার এক ছেলেও ডাক্তার?"

"ডাক্তারের পিতার কিডনীতে পাথর হবে না এমন কোন নিশ্চয়তাতো নেই।"২২

রাজা রেগে যান এবং হাকীম সাহেবকে বিদায় দেন। কিছুদিন পর লাহোর মেডিকেল কলেজের কর্নেল পেরী এবং আরও একজন ব্রিটিশ সার্জন কোন কারণে জম্মু যান এবং মহারাজা তাদেরকে রাজা সুরুজ কাউল-এর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার অনুরোধ জানান। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে রাজা তাদেরকে জানান, একজন হাকীম বলেছে, তাঁর কিডনীতে পাথর হয়েছে। তখন কর্নেল পেরী তাঁর সাথীকে ছিদ্র করে পাথর খুঁজতে বললেন। কিন্তু কোন পাথর পাওয়া যায়নি। কর্নেল পেরী ছুরি নিজ হাতে নিলেন এবং বড় করে কেটে পাথর খুঁজে পেলেন এবং বের করে নিয়ে এলেন। উভয় সার্জন হাকীম সাহেবের দক্ষতার প্রশংসা করলেন।

সুস্থতার পর রাজা সুরুজ কাউল পুনরায় মৌলভী নূরউদ্দীনকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তিনি জানতেন যে রাজা তার প্রতি সৎভাব রাখেন না। তিনি সেখানে গেলেও সম্পর্কের উন্নতি হবে না। মনে হচ্ছিল যে রাজা মৌলভী নূরউদ্দীনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়ে মহারাজাকে মানিয়ে নিয়েছিলেন আর হয়ত পরিষদে তাঁর সহকর্মীদের নিকট উল্লেখও করে থাকবেন। পারিষদদের একজন ছিলেন বাগ রাম। তিনি তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে বললেন, মহারাজার নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করা তাঁর জন্য ভাল হবে। তিনি তাঁকে বললেন, জীবিকার উৎসকে স্বেচ্ছায় নিজ হাতে বন্ধ করে দেয়াকে ইসলাম অনুমোদন করে না। তাছাড়া তিনি মনে করেন, এভাবে পদত্যাগ করা রাজার প্রতি অকৃতজ্ঞতার নামান্তর হবে। কিছুদিন পর তিনি পত্র পেলেন যে তাঁর চাকরী আর নেই।

তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় আধ্যাত্মিক গুরুকে তা জানালেন। তিনি (আ.) প্রত্যুত্তরে বললেন, "আল্লাহ্‌র কোন বান্দার প্রতি ভালবাসা প্রকাশের একটি মাধ্যম হলো তাকে পরীক্ষা করা। এটি এমনই একটি পরীক্ষা আর এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আল্লাহ্ ভাল জানেন কি পরিমাণ এবং কত আন্তরিকভাবে আমি আপনার জন্য দোয়া করেছি। আমি একটি আশাব্যঞ্জক উত্তরের আশায় দোয়া অব্যাহত রাখব। একজন নিবেদিত প্রাণ বন্ধুর জন্য দোয়ায় যেমন প্রভাব থেকে থাকে আপনার জন্য আমার দোয়ায়ও সে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের সর্বাধিপতি, চিরঞ্জীব সর্বশক্তিমান বাদশাহ্ এবং প্রভু, যাঁর দরবারে আমরা সদা সেজদারত, তাঁর শক্তি, করুণা ও দানের উপর আমাদের যে কেমন বিশ্বাস রয়েছে আর সে বিশ্বাস যে কত গভীর তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।"

মৌলভী নূরউদ্দীন রাজ্যের কোষাগার হতে বেশ বড় অংকের বেতন পেতেন। এছাড়া বিভিন্ন সময় তাঁকে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান উপহারও দেয়া হতো। সব মিলিয়ে তার যথেষ্ট আয় ছিল। এর পুরোটাই তিনি মহান উদ্দেশ্যে ব্যয় করতেন; যেমন এতীম, বিধবা, ছাত্র এবং দরিদ্রদের কল্যাণও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন হিন্দু দোকানদার প্রায়শ তাঁকে ভাবী দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করার পরামর্শ দিতো। তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র উপর তাঁর যে পূর্ণ ভরসা আছে এটি তার পরিপন্থী কাজ হবে। আর আল্লাহ্ সবসময় তাঁর চাহিদা পূরণ

করবেন। যে দিন তিনি চাকরি হতে অব্যাহতি পত্র পেলেন দোকানী তার কাছে এলো এবং জিজ্ঞেস করল, "আমার পরামর্শ মনে আছে মৌলভী সাহেব!" তিনি বললেন, তিনি তার পরামর্শকে বরাবরের মত এখনও ঘৃণা করেন।

দোকানীর সাথে কথা শেষ হবার পুর্বেই রাজ্য কোষাগারের এক বার্তাবাহক কোষাগারের পক্ষ থেকে তাঁকে একটা পত্র দিল যার সাথে তিনি সে মাসে যত দিন কাজ করেছেন এর বেতন বাবত ৪৮০ রূপী ছিল। এতে দোকানদার অসন্তুষ্ট হলো এবং ভাবল, এটি কোষাগার কর্মকর্তাদের কান্ডজ্ঞানহীনতা বৈ কিছু নয়। দোকানদারের সম্বিৎ ফিরে আসার পূর্বেই রাণীর একজন দূত তাঁর পক্ষ থেকে বেশ বড় একটি অংক নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত। সাথে রাণী এ জন্যও ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছেন যে এ মুহূর্তে এর তুলনায় বড় অংক দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দোকানী পুরোপুরী কাবু হয়ে গেল। নিজের লজ্জা ঢাকার জন্য সে বিড়বিড় করে বললো, "ভাল কথা। কিন্তু আপনি তো এক ব্যক্তির কাছে প্রায় দু লক্ষ রূপী ঋণী। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তা পরিশোধের সন্তোষজনক ও যথাযথ ব্যবস্থা না করবেন সে আপনাকে যেতে দেবে না।" ঠিক তখনই ঋণদাতার একজন প্রতিনিধি এলো। করজোড় করে একান্ত শ্রদ্ধার সাথে সে বললো, "আমাকে আমার মালিকের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আপনার মালমাত্তা প্রেরণসহ ফেরত যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেই আর একই সাথে আপনার যত টাকা প্রয়োজন তা যেন অগ্রিম নগদ আপনার সামনে পেশ করি।" মৌলভী সাহেব তাকে বললেন, "আপনি আপনার মালিককে ধন্যবাদ জানাবেন এবং বলবেন, কোষাগার এবং অন্য উৎস থেকে আমি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক টাকা পেয়ে গেছি এবং আমি নিজেই আমার সমস্ত মালামাল সাথে নিয়ে যেতে পারবো।"

দোকানদার দাঁড়ালো এবং মাথা নেড়ে বললো, "মনে হয় আল্লাহ্ পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন। কয়েক টাকা আয়ের জন্য আমাদেরকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় আর এখানে ঋণদাতা নির্বোধকে দেখ, যে ঋণ ফেরত না চেয়ে আরো দেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে ।"

মৌলভী সাহেব বললেন, "আল্লাহ্ তাঁর দাসের মনের অবস্থা ভাল জানেন। আমি ইনশাআল্লাহ্ সত্বর এ ঋণ পরিশোধ করবো। এ বিষয়গুলো আপনার বোধশক্তির ঊর্দ্ধে।"২৩

জম্মু থেকে তিনি ভেরা চলে গেলেন এবং সেখানে একটি বিশাল বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিলেন যা যুগপৎ তাঁর বাসস্থান এবং ক্লিনিকের কাজ দেবে। নির্মাণ কাজ চলাকালে কিছু নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য তাঁকে লাহোর যেতে হলো। লাহোরে নিজ কাজ শেষে তিনি ভাবলেন, ভেরা গমন একদিন বিলম্বিত করে হযরত মির্যা সাহেবকে দেখার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে একটি সংক্ষিপ্ত সফর করা যেতে পারে। তাঁর সাথে কথা বলার সময় হযরত মির্যা সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এখন অবসর আছেন?" তিনি ইতিবাচক উত্তর দিলেন। তিনি ভাবলেন, আজই ফিরে যাবার অনুমতি নেয়া সমীচীন হবে না। এরপর তিনি ভাবলেন, তাঁকে ফিরে যাওয়ার প্রোগ্রাম দুদিন স্থগিত রাখা উচিত। পরের দিন হযরত সাহেব বললেন, "আপনার দেখাশোনা করার জন্য মানুষ প্রয়োজন তাই আপনি আপনার স্ত্রীকে ডেকে পাঠান।" তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখলেন, তিনি যেন কাদিয়ান চলে আসেন আর সাথে একথাও বললেন, তাকে হয়ত কিছুদিন কাদিয়ান অবস্থান করতে হবে তাই নির্মাণ কাজ স্থগিত করে দেয়া হোক। তাঁর স্ত্রীর কাদিয়ান আসার পর একদিন হযরত সাহেব বললেন, "মৌলভী সাহেব, আপনি বই ভালবাসেন তাই ভেরা থেকে আপনার বই আনিয়ে নিতে পারেন।" তিনি সে অনুসারে ব্যবস্থা নিলেন। কিছুদিন পরে তাঁকে বলা হলো, ভেরাকে এখন আর তার ঘর ভাবা উচিত হবে না। এতে তার কিছু চিন্তা হলো। তিনি হয়ত পুনরায় ভেরা যাবেন না কিন্তু ভেরাকে নিজ ঘর মনে না করা হয়ত তার জন্য সম্ভব হবে না। তিনি পরে প্রায় বলতেন, আল্লাহ্ নিজ করুণায় তার চিন্তা প্রবাহকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেন যে নিজ বাড়ী হিসেবে ভেরার কথা আর কখনও তাঁর মনেই পড়েনি। তখন কাদিয়ান কয়েক শত লোকের বসতিপূর্ণ ছোট্ট একটি উপ-শহর ছিল যা নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন ও টেলিগ্রাফ অফিস থেকে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত আর যার সাথে সংযোগ রক্ষা হতো একটি গর্ত বহুল বেলে পথের মাধ্যমে। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল ছোট একখানা সাব পোষ্ট-অফিস। শহুরে সুযোগ-সুবিধার কোন বালাই ছিল না। এমন কি পানীয় জলের সরবরাহও ছিল একান্ত ভংগুর দশায় । মৌলভী নূরউদ্দীন কাঁচাইটের অতি সাদামাটা ঘরে বসবাস আরম্ভ করলেন। তাঁর আত্মার বহুকালের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি আনন্দিত। আধ্যাত্মিক নেতা যিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করার জন্য খোদা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন তাঁর সামনে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ।

ভেরার একজন সম্মানিত নাগরিক তাঁকে

লিখলেন, তিনি অসুস্থ আর তিনি যেহেতু তাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন তাই তার ইচ্ছা তিনি যেন ভেরা এসে তাকে চিকিৎসা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি লিখলেন, তিনি ভেরা থেকে হিজরত করে এখন স্থায়ীভাবে কাদিয়ান বসবাস করছেন। আর তাঁর নেতা হযরত মির্যা সাহেবের অনুমতি ছাড়া কাদিয়ান থেকে বাইরে যেতে পারবেন না। রোগী তখন হযরত মির্যা সাহেবকে অনুরোধ নামা লিখলেন, মৌলভী নূরউদ্দীকে বলুন তিনি যেন এসে আমাকে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। নির্দেশ পাবার পর মৌলভী নূরউদ্দীন ভেরা গেলেন, রোগীকে শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত তাঁর বাসায় দেখলেন । তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগীকে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন আর শহরে প্রবেশ না করে বা কোন বন্ধুর সাথে দেখা না করে বা পুরনো পারিবারিক কুঠি এবং আংশিক নির্মিত ঘরটির দিকে না তাকিয়ে কাদিয়ান ফিরে এলেন যেন ভেরা কখনও তাঁর বাড়িই ছিল না।

রাওয়ালপিন্ডির এক ধনী ব্যক্তি কাদিয়ান এলেন এবং হযরত মির্যা সাহেবকে অনুরোধ করলেন, আমার পরিবারের একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার জন্য মৌলভী নূরউদ্দীনকে পিন্ডি যাবার নির্দেশ দিন। হযরত সাহেব তাঁকে বললেন, "আমি নিশ্চিৎ, যদি আমি মৌলভী সাহেবকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলি বা আগুনে লাফ দিতে বলি তিনি দ্বিধা না করে তাই করবেন। কিন্তু আমাকে তাঁর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে। তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা তাই আমি তাঁকে কাদিয়ানের বাইরে যেতে বলতে পারি না।" মৌলভী সাহেব যখন এটি শুনলেন তিনি গভীরভাবে আন্দোলিত হন আর তাঁর নেতা তাঁর প্রতি এতটা আস্থা রাখেন দেখে তিনি আনন্দ প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলেন না ।

একবার একজন প্রখ্যাত নবাব কাদিয়ানে আসেন এবং মৌলভী নূরউদ্দীনের চিকিৎসাধীন ছিলেন। একদিন তার দুজন কর্মচারী তাঁর কাছে এসে বললো, রাজ্যের লেফটেনেন্ট গর্ভনর প্রদেশের যে অঞ্চলে নবাবের বাস সে অঞ্চল পরিদর্শনে আসছেন। তিনি চান যেন মৌলভী সাহেব তাঁর সফর সঙ্গী হন আর সে সময় যেন তিনি উপস্থিত থাকেন। তিনি বললেন, তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর অনুমতি ছাড়া কাদিয়ান থেকে বের হতে পারবেন না। তারা হযরত মির্যা সাহেবের অপেক্ষা করতে থাকলো এবং নবাবের ইচ্ছার কথা জানালো। তিনি তাদেরকে বললেন, "এখানে মৌলভী সাহেবের কার্যক্রম অনেকের জন্য দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের কারণ তাই আমি মনে করি না যে একটি সাধারণ বিষয়ের জন্য তা স্থগিত হয়ে যাক।"

বাটালার একজন হিন্দু তার অসুস্থ স্ত্রীকে পরীক্ষা করে তাঁর কাছে পরামর্শ দেয়ার আকুতি জানালেন। হযরত মির্যা সাহেব তাঁকে একাজে বাটালা যাবার অনুমতি প্রদান করেন এবং তিনি সেই রাতেই ফিরে আসবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বাটালা যান, মহিলাকে পরীক্ষা করেন এবং ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব করেন। যখন তিনি ফিরে আশার মনস্থ করলেন তখন ছিল রাত। আর প্রবল বৃষ্টিও আরম্ভ হয়। সবাই তাঁকে রাতের এই চরম ভয়াবহ সফরে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে বের হতে বারণ করে। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহিত হবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর নেতা তাঁকে সে রাতে ফিরে আসতে বলেছেন তাই তিনি তাঁকে নিরাশ করবেন না। তিনি প্রবল ঝড়কে উপেক্ষা করে বীরত্বের সাথে সকল বিপদ পাড়ি দেন এবং রাতের শেষ প্রহরে কাদিয়ান পৌঁছেন। হযরত মির্যা সাহেব একান্ত উদ্বেগের মাঝে রাত অতিবাহিত করেন আর ফজরের নামায শেষে জিজ্ঞেস করেন, মৌলভী সাহেব নিরাপদে পৌঁছেছেন কিনা? তিনি সামনে এগিয়ে এসে বলেন, তিনি পৌঁছে গেছেন।

কাদিয়ানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করার এক বছরের মাথায় এক ব্যক্তি জম্মু থেকে কাদিয়ান আসেন এবং মৌলভী নূরউদ্দীনকে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা নগদ প্রদান করেন। ঠিক এত টাকাই তিনি পাওনাদারের কাছে ঋণী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ টাকা তাকে কেন দেয়া হলো? সে ব্যক্তি বললো, মহারাজা পূর্বের বছর রাজ্যের জঙ্গল ঠিকা দেয়ার সময় এই শর্ত রেখেছিলেন যে ঠিকাদার তার মোট আয়ের অর্ধেক মৌলভী নূরউদ্দীনকে দেবে। সেই ভিত্তিতে টেন্ডার দেয়া হয় আর তিনি ঠিকা পেয়েছেন আর লভ্যাংশের অর্ধেক মৌলভী নূরউদ্দীনকে হস্তান্তরের জন্য এসেছেন। হযরত মৌলানা সাহেব তাকে বললেন, আপনি টাকা জম্মু নিয়ে যান এবং এই টাকা আমার পাওনাদারকে ফেরত দিন। পরবর্তী বছর পুনরায় ঠিকাদার লাভের অর্ধেক নিয়ে তাঁর কাছে এলেন কিন্তু মৌলভী সাহেব তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। ঠিকাদার বললেন, তিনি তাঁকে এই টাকা দিতে বাধ্য কেননা এটি তার ঠিকার শর্ত। কিন্তু মৌলভী সাহেব এক পয়সাও নিবেন না বলে জানিয়ে দেন। ঠিকাদার বললেন, "আপনি গত বছর গ্রহণ করেছেন!" (তিনি বললেন) "সেটি আমাকে ঋণ মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। আমার এখন তেমন কোন প্রয়োজন নেই।"

[পুস্তক ঃ "হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)" বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৮০-৮৫]

বর্তমান আখেরী জামানা। এই আখেরী জামানায় প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনের কথা দলমত নির্বিশেষে সকলই স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি কখন কোথায় আসবেন নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম-ওলামা, ইসলামিক চিন্তাবিদ, পন্ডিতগণ যুক্তি প্রমাণহীন রূপ কথার নানান গল্পগুজব আজগুবি কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে মেতে আছেন। যেগুলি কিনা হাস্যরসের খোরাক ব্যতীত যুক্তি প্রমাণ হিসেবে কানা কড়ি কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। "সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে।" (সূরা আনফাল)

ইসলামিক চিন্তাবিদ পন্ডিতগণ বলে থাকেন যে, চল্লিশ বৎসর বয়:ক্রম কালে একদিন কাবা শরীফ তওয়াফরত অবস্থায় লোকজন তাঁকে চিনতে পারবে যে, ইনিই আমাদের সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী। যিনি মুসলীম কওমের নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর সহযোগী হিসাবে আল্লাহ্ তাআলা আরেকজনকে অপেক্ষায় তাঁর কাছে আসমানে তুলে রেখেছেন। তিনি হলেন ঈসা রুহুল্লাহ। দাজ্জাল অপশক্তির বিরুদ্ধে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে সহযোগিতা করার জন্য একদিন ফজরের নামাযের সময় দামেস্কের মসজিদের ছাদে ঈসা রুহুল্লাকে নামিয়ে দেয়া হবে। তারা দুইজন মিলে লম্বা তলোয়ার হাতে নিয়ে কাফেরদেরকে নিধন করবে। দাজ্জাল অপশক্তির হাত থেকে মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করবেন। এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, বর্তমান এই আনবিক যুগে কাফেররা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিবে?

দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামাযে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে করুণা ভিক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করা হয় যে, হে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে অভিশপ্ত ইহুদী এবং পথভ্রষ্ট খ্রিষ্টানগণের পথে চালিত করো না। প্রশ্ন

ঈসা সদৃশ নবী

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

এই যে, ইহুদীগণ কি কারণে অভিশপ্ত হলো এবং খ্রিষ্টানগণ পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ কি?

মানবকূল শ্রেষ্ঠ খাতামান্নাবীঈন হযরত রসূল আকরাম (সা.) এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতগণ হুবহু ইহুদী খ্রিষ্টানগণের পথ অনুসরণ করবে" এই অনুসরণ বুঝতে এবং বুঝাতে ইসলামি চিন্তাবিদ পন্ডিতগণ কোট প্যান্ট টাই ইত্যাদি পোষাক পরিচ্ছদ বুঝেন এবং বুঝান। তারা পায়ের গোড়ালো পর্যন্ত লম্বা জুব্বা ঢিলা ঢালা আসকান পায়জামা সৌদি আরবের গামছা মাথায় পেঁছিয়ে সুন্নত পালনের গর্ব অহংকারে বুক স্ফীত করে চলেন। ইসলামে নির্দিষ্ট কোন পোষাক নেই। আর আল্লাহ্র প্রেরিত নবী রসূলগণ বাহ্যিক পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়ে সাধু সাজাতে আসেন না। তাঁরা আসেন বিশ্বাসে, ঈমানে আমলে তাক্ওয়ার পোষাক পরিয়ে খাঁটি ঈমানদার মু'মিন বানিয়ে আল্লাহ্র খাস বান্দারূপে পরিণত করার জন্য। হুযূর (সা.) এর যুগে এরকম লম্বা জুব্বা জামা ছিল না। এগুলি হযরত ওমর (রা.) যুগে পারশ্য থেকে আমদানি করা হয়। মানুষ কাপড় চোপড় পরিধান করে কেন? মাত্র দু'টি কারণে। প্রথমত লজ্জা নিবারন দ্বিতীয়ত শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে। তা না হলে কাপড় চোপড় পরিধান করার কোন প্রয়োজন ছিল কি? পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয় স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে।

সুপ্রিয় পাঠক, এবার আসুন বিবেকের কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখি ইহুদীগণই বা অভিশপ্ত হলো কি কারণে এবং খ্রিষ্টানগণই বা পথ ভ্রষ্ট হলো কেন। আল্লাহর প্রেরিত নবী হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন হয়েছিল ইহুদী জাতির মধ্যে তাদেরকে উদ্ধার কল্পে। যে কারণে ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি, তার প্রধান কারণ হলো হযরত ঈসা (আ.) এর আগমনের পূর্বে এলিয়া নবী, যিনি আসমানে জীবিত অবস্থান করছেন, তিনি আবার আসমান থেকে নেমে আসবেন, ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে হযরত ঈসা (আ.) এর বিরুদ্ধাচরণ করে ইহুদীরা তাঁকে শূলে দিয়ে হত্যার চেষ্টা করার কারণে ইহুদীগণ অভিশপ্ত জাতিরূপে পরিণত হলো। আর খ্রিষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেও পথ ভ্রষ্ট হওয়ার কারণ তাদের বিশ্বাসে "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ হেতু বাবা আদম পাপী ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আদম সন্তানগণ সকলই পাপী। ঈশ্বর তার একমাত্র জাতপুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। ঈশ্বর পুত্র যীশু ক্রুশের রক্ত দিয়ে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্য করে স্বর্গে নীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। যেরূপভাবে মেঘরথে আরোহন পূর্বক আবার তিনি পৃথিবীতে নেমে এসে প্রেম দ্বারা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।" মুসলমান পন্ডিতগণের বিশ্বাস, "খ্রিষ্টানদের নবী হযরত ঈসা (আ.) মরেন নি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বশরীরে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন আসমানে। আবার তিনি স্বশরীরে আসমান থেকে নেমে এসে দাজ্জালের কবল থেকে মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করবেন" হযরত রসূল করীম (সা.) এর বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে। ইহুদী খ্রিষ্টান ও মুসলমানগণ একই পথের যাত্রী। হযরত ঈসা (আ.) স্বশরীরে আসমানে জীবিত অবস্থান করছেন, আবার তিনি পৃথিবীতে নেমে আসবেন। এটা ক্রুশীয় মতবাদ। এই ক্রুশীয় মতবাদে বিশ্বাসী ইহুদী খ্রিষ্টান সদৃশ মুসলমান জাতিকে উদ্ধার কল্পে আল্লাহ্র প্রেরিত যে মহাপুরুষ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তিনি ঈসা (আ.) সদৃশ নবী। যাকে ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলা হয়। হাদীস গ্রন্থে রূপক ভাবে তাঁকেই ঈসা ইবনে

মরিয়ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আ.) নহেন। তিনি মুহাম্মদী ঈসা (আ.)। ইমাম মাহদী ও ঈসা মসীহ্ দুই ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি, দুইটি রূহানী উপাধী। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। ক্রুশ বলতে তামা, কাশা ও কাষ্ঠের নির্মিত ক্রুশ নহে। আর এগুলিকে তিনি লাঠি কুড়াল দ্বারা গায়ের জোরে ভাংগবেন না। অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ক্রুশীয় মতবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করবেন। ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়ে অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা বনি ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সাব্যস্ত করে কাশ্মীরে তাঁর কবর দেখিয়ে ক্রুশীয় মতবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মাটির ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছেন।

এক শ্রেণীর পন্ডিতগণ তাদের মনগড়া কাল্পনীক অবাস্তব কেচ্ছা কাহিনী গেয়ে থাকেন যে, শেষ নবী রহমতে আলম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানতে পেরে হযরত ঈসা (আ.) নাকি তাঁর উম্মত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে আসমানে তাঁর কাছে স্বশরীরে তুলে নিয়ে শেষ যুগের জন্য রিজার্ভ রেখেছেন। তিনি আবার আসমান থেকে নেমে এসে শেষ নবীর উম্মত হয়ে তার ঈমানী দায়িত্ব পালন করার পর মৃত্যু বরণ করবেন আর মহানবীর (সা.) রওজার পাশে কিছু খালি জায়গা আছে এখানেই ঈসা রুহুল্লাহকে কবর দেওয়া হবে। মহানবী (সা.) এর উম্মত হওয়ার ঈসা (আ.) এর এতই যদি সখ ছিল তাহলে মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় আসমান থেকে নেমে এসে হুযুর (সা.) এর হাতে হাত মিলিয়ে কলেমা পাঠ করে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে শ্রেষ্ঠতর উম্মত হওয়া উচিত ছিল নাকি? তিনি তো খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। আসলে মহানবী (সা.) এর শেষ্ঠত্বের কথা জানতে পেরে এরূপ আশা পোষন করেছিলেন হযরত মূসা (আ.), ঈসা (আ.) নহে। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ আছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কাছে মহানবী (সা.) এর প্রশংসা শোনে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্, আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। হযরত মূসা (আ.) পুনরায় আরজ করলেন, তবে আমাকে সেই নবীর উম্মতের এক উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন তুমি তার পূর্বেই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছো। আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জান্নাতে তার সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব।" (দেখুন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রচিত 'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতের মধ্যে নবীর আবির্ভাব ঘটবে। সেই নবী হবে এই উম্মতের মধ্য থেকে। পূর্ববর্তী কোন উম্মতের মধ্য থেকে নয়। পূর্ববর্তী কোন নবীকে এই উম্মতের মধ্যে শামিল করা হবে না। পূর্ববর্তী কোন নবীকে একজন উম্মতী নবী অথবা নবী হিসাবে পুনরায় এই উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করা হবে না। নবী অথবা উম্মত যে কোন ভাবে এই উম্মতের মধ্যে পুনরাগমনের জন্য হযরত মূসা (আ.) এর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি অথচ একটি মিথ্যা ভিত্তিহীন মনগড়া কল্পকাহিনী আবিষ্কার করা হয়েছে যে, ঈসা (আ.) হযরত নবী করীম (সা.) এর উম্মত হওয়ার জন্য খায়েস করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে, আল্লাহ্ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে স্বশরীরে তাকে আসমানে তুলে নিয়ে তাঁর কাছে রিজার্ভ রেখেছেন।

ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) কবরস্থ হয়েছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর গৃহে। সেখানে মাত্র তিনটি কবরের স্থান ছিল। হযরত নবী করীম (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) এর দাফন হওয়ার পর সে তৃতীয় স্থানটি ছিল, এটি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) নিজের জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু ইসলাম জগতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হবার সময় এসে গেছে জেনে তিনি তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) কে ডেকে বললেন, বৎস তুমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকার কাছে গিয়ে বল যে, ওমর ইবনে খাত্তাব সালাম পাঠিয়েছেন, আমিরুল মু'মিনীন হিসেবে বলবে না। তারপর আবেদন করবে যে, ওমর ইবনে খাত্তাবের একান্ত বাসনা যে, তার দুই ভাই অকৃত্রিম বন্ধুর পাশে আপনার হুজরায় তাকে দাফন করার অনুমতি দান করুন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর হুজরায় গমন করে দেখেন যে, তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর শুনে ক্রন্দনরত আছেন। তাঁর কাছে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর সালাম দিয়ে আবেদন পেশ করলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) উত্তর দিলেন যে, এই জায়গাটুকু আমি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম কিন্তু এ ব্যাপারে এখন আমি নিজের চেয়েও ওমর ফারুক (রা.)কে প্রাধান্য দিয়ে দিলাম। এরপর সেখানে চতুর্থ কবরের জায়গা না থাকায় হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর কবর অন্য স্থানে হয়। সুতরাং মহানবী (সা.) এর রওজার পাশে অবশিষ্ট কিছু জায়গা রেখে দেয়া হয়েছে এ কথা মনগড়া কাল্পনিক কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা ইহজগতে অন্ধ থাকবে পরজগতেও তারা অন্ধ থাকবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল) এ কথার মর্মার্থ এটা নয়

যে, মাতৃগর্ভে যারা চক্ষুহীন অন্ধ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবে পরজগতে তারাই অন্ধ থাকবে, বরং এ কথার মর্মার্থ এটাই যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান চক্ষু যাদের অন্ধ পরজগতে তারাই অন্ধ থাকবে, চিরকাল প্রত্যেক নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রূপক ভাষায় বর্ণিত হয়ে থাকে। জড়বাদী মানব সমাজ এর তাৎপর্য না বুঝতে পেরে আল্লাহ্‌র প্রেরিত সকল নবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে চিরকাল আপত্তি করেছে। ইসলামী চিন্তাবিদ পন্ডিতদের বিশ্বাসে হযরত ঈসা (আ.) সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাচ্যের লম্বা জুব্বা পরিধান করে আসমানে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আসমান থেকে নেমে আসবেন দুইটি হলুদ রং এর চাদর পরিহিত হয়ে। তিনি আসমানে গিয়েছিলেন খ্রিষ্টানদের নবী যীশু খ্রিষ্ট হিসাবে, আর আসমান থেকে নেমে আসবেন সম্ভবতঃ তিব্বতের দালাই লামা সন্যাসির বেশ ধারণ করে দামেস্কের শ্বেত মিনারের কাছে। তিনি চল্লিশ বৎসরে জগতের সমস্ত ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় শুকর বধ করবেন। অতঃপর দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতিকে খ্রিষ্টান ধর্মে নহে, বরং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করবেন কিন্তু তিনি স্বয়ং ছিলেন খ্রিষ্টান । যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে তিনি কতল করবেন। হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন স্বকীয় মর্যাদায় নবী। তাঁর আগমনে খাতামান্নাবীঈনের কোন তারতম্য হবে না, বা মোহর ভাঙ্গবে না এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মান মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না। এই বিশ্বাসের কারণেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে মানতে পারছেন না, কেননা তিনি স্বশরীরে আসমান থেকে কাদিয়ানে নেমে আসেন নি।

লবন যেমন পানিতে গলে যায় তদ্রূপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও চাহনিতে কাফেরগণ নিধন হয়ে যাবে। যদি তাই হয় তাহলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে কাফেরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন কি? এখানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে মারা যাওয়ার মর্মার্থ দোয়া, দোয়ার চ্যালেঞ্জ, মোবাহেলা ইত্যাদি। হলুদ রং এর চাদর পরিহিতের মর্মার্থ, রোগাক্রান্ত থাকা। এবং শ্বেত মিনার বলতে হিমালয় পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গ।

"তাদের চর্ম চক্ষু অন্ধ নহে বরং অন্তর চক্ষু অন্ধ"। তারা দেখবে না, বুঝবে না ও চিনবে না। খোদা তাআলা বলেন, "তারা বুঝবে না এই জন্য নিশ্চয়ই আমরা তাদের হৃদয়ের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি এবং কর্ণ বধির করে দিয়েছি। আর যদি তাদেরকে হেদায়াতের পথে ডাক, তবে কস্মিন কালেও তারা সৎপথ পাবে না" (সূরা কাহাফ)।

এই অন্ধত্বের কারণেই যারা বলে খোদা এক পুত্র গ্রহণ করেছে, সেই ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টানগণই সে দাজ্জাল' কুরআন হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ থাকলেও তারা বুঝতে পারছে না। তারা চেয়ে আছে আরব্য উপন্যাসের দৈত্য দানবের ন্যায় এক দাজ্জালের অপেক্ষায়। "এবং যেন এই সকল লোকদেরকে সতর্ক করে, যারা বলে আল্লাহ্ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে।" (সূরা কাহাফ) দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 'দাজ্জাল' মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য সম্পাদন করবে, ধর্মের আড়ালে দুনিয়ার ফেৎনা ফাসাদ ছড়াবে। পবিত্র কুরআন করীমে এই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে খ্রিষ্টান পাদ্রীদেরকে, যারা ছলনার ছদ্মবেশে নানান রূপ কলাকৌশলে মিথ্যাকে সত্য বানায়, সত্যকে মিথ্যা বানায়। মিথ্যাবাদীগণই দাজ্জাল। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'দাজ্জালুনা কাযযাবুনা' 'দাজ্জালগণ, মিথ্যাবাদীগণ'। খ্রিষ্টান পাদ্রীগণই এই জনঘন্যতম মিথ্যা কথাটা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে প্রচার করে যে, খোদা একজন নহে। খোদা এক খোদা, মরিয়ম এক খোদা, খোদার পুত্র যীশু এক খোদা, তিনে এক একে তিন। এই বিশ্বাস পাদ্রীদের প্রবর্তিত ত্রিত্ববাদিতাই দাজ্জালিয়ত। এটা ক্রুশীয় বিশ্বাস, এই ক্রুশীয় বিশ্বাসের মূল উৎপাটন করে চিরতরে সমাধিস্থ করেছেন ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) প্রমাণ করেছেন ঈসা (আ.) একশত কুড়ি বৎসর বয়সে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তার মরদেহ সমাধিস্থ আছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের খানইয়ার মহল্লায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ঈসা (আ.) এর মৃত্যু প্রমাণে প্রচলিত খ্রিষ্ট ধর্মের মৃত্যু। আর এটাই হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত 'ক্রুশ ভঙ্গ' এবং 'দাজ্জাল' বধ। হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 'দাজ্জালের কপালে কাফ, ফে, রে, অন্য কথায় কাফের লিখা থাকবে, অশিক্ষিত মু'মিনগণও তা পড়তে পারবে, কিন্তু মু'মিন না হলে শিক্ষিতগণও পড়তে পারবে না" প্রশ্ন এই যে, মুসলমানেরা নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জব্রত পালন করে, তবুও কি তারা মু'মিন হতে পারলো না? ঈমান এবং আমল মুসলমান হওয়ার লক্ষণ। আমল না থাকলে ঈমানের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি ঈমান না থাকলে আমল হয় অর্থহীন। আল্লাহর প্রেরিত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রতি মুসলমানগণ যতদিন ঈমান না এনে ক্রুশীয় মতবাদে বিশ্বাসী থাকবে ততদিন তাদের অন্তর চক্ষু খুলবে না, আমলও হবে অর্থহীন আর আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা ঈমানদার মু'মিন বলে গণ্য হবে না। প্রমাণ শূন্য আমলে উত্থানেরও তাদের আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। যতই চেষ্টা প্রচেষ্টা করুক। এটা মনগড়া কাল্পনিক কথা নয়, সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ তাআলার অমোঘ বিধান। পরিশেষে প্রার্থনা করি সত্যকে জানার চিনার এবং গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা সকলের অন্তর দৃষ্টি খুলে দিন, আমীন!

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

হযরত আলী (রা.)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) নবুওয়্যাতের দশ বছর আগে ৬০০ খৃষ্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশিমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য, হযরত আলী কাবাগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা। নবী করীম (সা.) তাঁর প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা জাহরা (রা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.)-কে বিয়ে দেন।

হযরত আলী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর তিনি যখন ঘরে ফির ছিলেন তখন পথেই তাঁর সাথে হযরত আলী (রা.)-এর দেখা হয় এবং আলী (রা.)-কে ওহী প্রাপ্তির কথা বলেন। হযরত আলী (রা.) তখনি দ্বিধাহীন চিত্তে ও উদ্দীপিত হৃদয়ে দ্বীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনেন। এ সময়ে হযরত আলী (রা.)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র দশ বছর। এরপর নারীদের মধ্যে প্রথম উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) ও বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে নবী করীম (সা.)-এর বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) ঈমান আনেন। অতপর আল্লাহর নির্দেশেরসূল করীম (সা.) যখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের আল্লাহর পথে ডাক দেন, আহুত বৈঠক থেকে একমাত্র হযরত আলী (রা.)-ই সর্বসমক্ষে ইসলাম গ্রহণ এবংরসূল করীম (সা.)-এর সহযোগী হবার কথা ঘোষণা করেন।

হযরত আলী (রা.) খলীফা নির্বাচিত ঃ

নির্মমভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মদীনা মুনাওয়ারার পরিবেশ বিশৃঙ্খলা, ফিতনা ফ্যাসাদের ধুলায় আস্বাদিত ছিল। বহিরাগতরা মিসর, কুফা, ও বসরার দুস্কৃতিকারীরা মদীনায় ভরপুর ছিল। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ দেশের সেনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সীমান্ত এলাকায় ও বিভিন্ন প্রদেশে বিক্ষিপ্ত ছিলেন, কেউ কেউ হজ্বব্রত পালনের জন্য মক্কায় অবস্থান করছিলেন, আর কেউ কেউ মদীনায় ফিতনা-ফ্যাসাদের অধিক দেখে বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিল। অবশ্য অল্প সংখ্যক মদীনায় উপস্থিত ছিলেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিন দিন যাবত খেলাফতের আসন খালী ছিল। গাফেকী (মিসরীয় দুষ্কৃতিকারীদের নেতা) মসজিদে নববীতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে লাগল। এ সময়ে বহিরাগতরা হযরত আলীর (রা.) নাম খলীফা হিসেবে প্রস্তাব করল এবং তাকে এ পদ গ্রহণের জন্য আবেদন করল। হযরত আলী (রা.) প্রথমে অস্বীকার করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামেরও এ মত, তখন তিনি (৬৬৫ খৃষ্টাব্দে) এ গুরু দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করে নিলেন।

মালিক আশতার সর্বপ্রথম বয়াত করল। তারপর অন্যান্য লোকেরাও বয়াত করলেন হযরত আলী (রা.)-এর হাতে। হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়র (রা.) যেহেতু হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাবিত শুরার সদস্য ছিলেন এবং তাদের পক্ষ হতে বিরোধিতার আশংকা ছিল, সেজন্য হযরত আলী (রা.) তাঁদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন, আপনি যদি খেলাফতের আকাংখী হন তাহলে আমি আপনার হাতে বয়াত করতে প্রস্তুত রয়েছি। এ প্রস্তাব উভয়েই প্রত্যাখ্যান করলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, তাহলে আপনারা আমার হাতে বয়াত করেন। একথা শুনে হযরত তালহা (রা.) কিছুটা ইতস্ততঃ করলেন। এতে মালিক আশতার তলোয়ার উচিয়ে ধরে বলল, বয়াত করুন অন্যথায় এখনই দেহ হতে মাথা পৃথক করে ফেলব। তারপর তাঁরা উভয়েই বয়াত করলেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে সকল স্তরের সমবেত লোকজন স্বেচ্ছায় ২১শে জিলহজ্জ সোমবার দিন (২৩শে জুন ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ) হযরত আলী (রা.) এর হাতে বয়াত গ্রহণ করে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করেন।

হযরত আলী (রা.)-এর ইল্‌ম ঃ

হযরত নবী করীম (সা.)-এর কোলে তিনি লালিত পালিত হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই হযরত আলী (রা.) নবুওয়্যাতের শিক্ষা অঙ্গন থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (সা.)-এর সাথে তাঁর যে গভীরতম সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তারই দৌলতে তিনি এ পর্যায়ের অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক সুযোগ লাভ করেছিলেন। ঘরে বাইরে ও বিদেশে যাত্রাকালে তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিবিড়তম নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন বিধায় দ্বীন

ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ হয়েছিল। নবী করীম (সা.) নিজেও তাঁকে এই বিশেষ জ্ঞান দান করার জন্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নিজে তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের তুলনায় তার মনীষা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীরতর। নবী করীম (সা.) তাঁর এই মনীষার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার দ্বার বিশেষ।' সাধারণ লেখাপড়া হযরত আলী (রা.) বাল্যকালেই শিখে নিয়েছিলেন এবং ওহী লেখকদের তালিকায় তাঁর নামও শামিল রয়েছে। নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বহু রাষ্ট্রীয় ফরমানসহ হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে সুলিখিত হয়েছিল। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস কুরআন মজীদ। হযরত আলী (রা.)-এ কুরআনের মহাসমুদ্র মন্থন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যে ক'জন সাহাবী নবী করীম (সা.)-এর ইহ জীবনকালে পূর্ণ কুরআন মজীদ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন, হযরত আলী (রা.) তাদের অন্যতম। কুরআনের কোন সূরা বা কোন আয়াত কি প্রসঙ্গে ও কোন সময় নাযিল হয়েছিল, এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

হযরত আলী (রা.) ছিলেন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানের দিক দিয়ে সকলের শীর্ষে।রসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমি সব সময়ই সত্য (হক) এবং কুরআনের সাথে, আর সত্য ও কুরআন সব সময় আলীর সাথে এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তারা আলাদা হবে না।

হযরত আলী (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ

হযরত আলী (রা.) উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি জাহিলিয়াতের যামানায়ও কখনোই মূর্তিপূজা করেননি। অন্যদিকে মক্কা বিজয়ে নবী করীম (সা.) যখন কাবা ঘরের মূর্তি ভাঙ্গার হুকুম দেন তখন সবচেয়ে বড় মূর্তি যা কাবার শীর্ষে স্থাপিত ছিল, তা ভাঙ্গার গৌরব তিনিই লাভ করেন।

হযরত আলী (রা.) আল্লাহর ইচ্ছার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনেক সময় আল্লাহর ভয়ে মূচ্ছা যেতেন এবং অনেক সময় এ অবস্থায় মনে হত যে তিনি মারা গেছেণ। তিনি সালাতে দাঁড়ালে নিজেকে ও দুনিয়াকে ভুলে যেতেন। একবার এক যুদ্ধে তাঁর পায়ে একটা তীর বিঁধে যায়, তীব্র ব্যথার কারণে যা তোলা যাচ্ছিল না। কিন্তু তিনি ঐ তীর পায়ে থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতে শুরু করেন, তাঁর সিজদার মুহূর্তে অন্যরা তীরটি টেনে বের করে ফেলেন, কিন্তু আলী (রা.) টের পেলেন না।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর চার বছর কালীন খেলাফতের শাসন আমলে তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কৃতসংকল্প ছিলেন এবং সে কালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনায় কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন সাধনে কিছুমাত্র সম্মত ছিলেন না।

হযরত আলী (রা.)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের কার্যাবলী ও আচার-আচরণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হযরত আলী (রা.) এ বিশেষ বিষয়টির উপর সব সময় সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। তিনি যখন কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে কাউকে নিয়োগ দান করতেন, তখন তাঁকে অতীব মূল্যবান ও কল্যাণময় উপদেশবাণী দিতেন। নানা সময় এসব কর্মকর্তার কার্যাবলী ও আচার-আচরণ সম্পর্কে বিশেষভাবে তদন্ত করতেন।

হযরত আলী (রা.)-এর চরিত্রের সুমহান গুণাবলী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সরকারী কর্মচারীদের অপচয় ও ব্যয়বহুল এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ বিষয়ে তাদের অনিয়মতান্ত্রিকতা কঠোর হাতে দমন করতেন। অক্ষম ও দরিদ্র জনতার প্রতি তিনি সব সময় উদার নীতি গ্রহণ করতেন। বস্তুতঃ হযরত আলী (রা.)-এর সত্তা ছিল সাধারণ জনমানুষের জন্য আল্লাহর অপার রহমতের বাস্তব নিদর্শন ও জ্বলন্ত প্রতীক। সমাজের সাধারণ হত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের দ্বার ছিল সদা উন্মুক্ত। বায়তুলমালে যা কিছুই সঞ্চিত ও সংগৃহীত হত তা অভাবগ্রস্থ ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে অবিলম্বে উদার হস্তে বণ্টন করে দেয়া হত। তার দরুন জনকল্যাণের দিক দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর এই দানশীলতার কারণে তিনি ইতিহাসে অমরতা লাভ করেছেন।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হযরত আলী (রা.) ঃ

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হযরত আলী (রা.) সর্বদা সচেতন থাকতেন। বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহারকে তিনি জঘন্য অপরাধ

বলে মনে করতেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি মুসলিম ও অ-মুসলিমদের মধ্যে কোনরূপ ভেদনীতিকে প্রশ্রয় দিতেন না।

হযরত আলী (রা.)-এর ভাষণ ঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে এবং যিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে এবং যিনি তাঁর ঔদার্যের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অত্যন্ত নিকটে। তিনি সকল প্রকার পুরস্কার প্রদানকারী এবং সম্মান প্রদানকারী এবং তিনি সকল দুর্দশা ও দুঃখকে দূর করেন। আমি তাকে তাঁর অনবরত করুণার জন্য প্রশংসা করি এবং তাঁর দানশীলতা ও ঔদার্যের জন্য প্রশংসা করি। আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, কেননা তিনি প্রথম এবং সর্বকালের এবং তিনি প্রকাশ্য। আমি তাঁর নিকট থেকে নির্দেশনা কামনা করি, কেননা তিনিই নিকটবর্তী এবং তিনিই পথপ্রদর্শক। বিপদ এবং দুর্দশা থেকে উদ্ধারের জন্য আমি তাঁর সাহায্য যাঞ্ছা করি, কেননা তিনি পরম শক্তিমান এবং তিনি পরাভূতকারী। আমি তাঁর উপর নির্ভর করি, কেননা তিনিই যথেষ্ট এবং পরম শক্তিমান এবং তিনিই একমাত্র সহায়ক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং তাঁর বার্তা বহনকারী। তিনি তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর আদেশাবলীকে কার্যকর করবার জন্য এবং মানুষের নিকট তাঁর আদেশকে প্রকাশ্য করবার জন্য এবং অনন্ত শাস্তির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করবার জন্য।

হে আল্লাহর সৃষ্টি মানব সন্তান! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে ভয় করবার জন্য। যিনি বিভিন্ন উদাহরণ প্রকাশ করেছেন এবং তোমাদের জীবনের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে গাত্রাবরণ দিয়েছেন এবং তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছেন সর্বত্র। তিনি তোমাদেরকে তাঁর অপরিসীম ঔদার্যে অনেক উপঢৌকন দিয়েছেন। অনেক যুক্তির সাহায্যে তিনি তোমাদের জন্য সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং তিনি তোমাদের সবাইকে গণনার মধ্যে রেখেছেন। পরীক্ষার এই পৃথিবীতে এবং ধ্বংসের এই নিলায় তিনি তোমাদের জীবনকাল নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আমি তোমাদের সকলকে বলি যে, আল্লাহকে ভয় কর। তিনি সমস্ত অন্যায়ের জন্য পূর্বাহ্নেই শাস্তির বিধান জানিয়েছেন এবং যথার্থ পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি তোমাদের সেই শত্রু সম্পর্কে সাবধান করেছেন, যে গোপনে তোমাদের চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের বিচলিত করে, সে গোপনে তোমাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে এবং তোমাদের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে, সে তোমাদের মিথ্যা প্রলোভন দেয় এবং একটি ভ্রান্তির মধ্যে তোমাদেরকে নিমগ্ন করে। পাপকে সে আকর্ষণীয় রূপে তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত করে এবং অন্যায়কে কোন গুরুত্ব দেয় না।

হে সৃষ্ট জীবন সকল! তোমাদের চোখ আছে দেখবার জন্য, কান আছে শুনবার জন্য এবং স্বাস্থ্য আছে, ঐশ্বর্য আছে। কিন্তু মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই। এমন কোন আশ্রয় নেই, এমন কোন অবলম্বন নেই, যেখানে তুমি প্রত্যাবর্তন করতে পার। সুতরাং কেন তোমরা ভ্রান্তিতে পতিত হবে? তোমরা মনে রাখবে এখনই তোমাদের জন্য পূণ্যকর্মের প্রশস্ত সময়। এখন তোমাদের গলায় কোন রজ্জু নেই, এখনই তোমরা পূর্ণ চৈতন্যে বাস করছো, এখনই তো আল্লাহর আদেশ মান্য করার সময়। অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সময় তো এখনই। মৃত্যুর আগমনের পূর্বে আল্লাহর ভয়ে ভীত হও এবং শুভ ও কল্যাণকর্মে নিজেকে নিয়োজিত কর।

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদত ঃ

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম হযরত আলী (রা.) আবাসস্থল কুফায় এল। এখানে এসে সে, খারেজী গোত্রের এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে হযরত আলী (রা.)-কে হত্যার ফন্দি আঁটতে লাগল। তারা উভয়ে এ কাজে আরো দু'জন খারেজীকে অন্তর্ভুক্ত করল। অবশেষে রমজানের ১৭ তারিখে ইবনে মুলজিম ও তার দুই সহযোগী কুফার জামে মসজিদে আত্মগোপন করে বসে রইল। ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী (রা.) মসজিদে প্রবেশ করে যথারীতি ঘুমন্তদের জাগ্রত করতে লাগলেন। ঘাতকদের একজন গুপ্তস্থান হতে বের হয়ে তাঁর উপর তলোয়ারের আঘাত হানল। হযরত আলী (রা.) মেহরাবে লুটে পড়লেন, ইবনে মুজলিম তাঁর মাথায় পুনরায় আঘাত করল। এতে তাঁর সমস্ত শরীর ও দাঁড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। ইবনে মুলজিম ধরা পড়ল ও অপর দু'জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। আশংকাজনক অবস্থায় হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হল। অবশেষে সেদিন রাতেই তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদতের মধ্যে দিয়েই ইসলামে একক খেলাফত ব্যবস্থা শেষ হয়ে যায়। তার পরেই শুরু হয়ে যায় জুলুম অত্যাচারের রাজত্ব।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

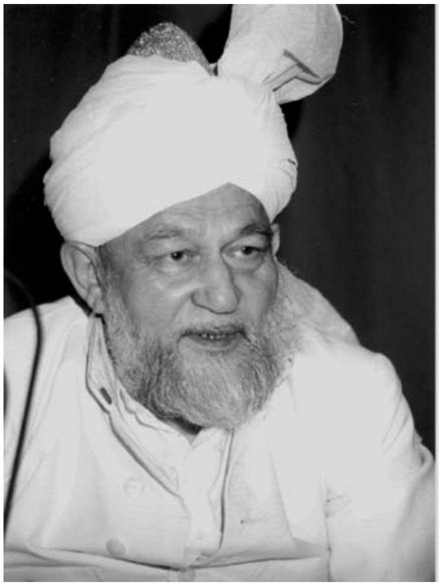

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আখেরী যামানার ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ থেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে অনুবর্তী সৃষ্টি শুরুর পর দু'জন বঙ্গবীর তাঁর হাতে বয়আত করে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তারা হলে (১) চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামের হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.)। তিনি ১৯০৫ সালে কাদিয়ানে বয়আত করেন। এবং (২) বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার অন্তর্গত নাগের গাঁও গ্রামের হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ (রা.)। তিনি ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। একজন পুণ্যবতী তাক্ওয়াপরায়ণা মহিলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট ১৯০৭ সালে পত্রের মাধ্যমে বয়আত করার গৌরব অর্জন করেন। তিনি সাহাবী হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ (রা.) এর সহধর্মিনী সৈয়দা আজিজাতুন নেসা সাহেবা। পরবর্তীতে কুদরতে সানীয়ায় ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠাতায় বিশ্বব্যাপী আহমদীয়তের প্রচার ও প্রসারের ক্রমবর্ধমান প্রবাহে বঙ্গদেশেও আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে ১৯১৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নির্দেশে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ডা. মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.)-এর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শুভাগমনে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া গঠিত হয়। ১৯১৬ সালে ইমারত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু হায় ! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পদধূলিতে ভারতবর্ষের অনেক স্থান পুণ্যভূমিতে পরিণত হলেও বঙ্গদেশের মাটি তাঁর পদচারণে ঐশী নূরের পরশ লাভের সৌভাগ্য পায়নি। বিশ্ব মানবতার শান্তির দূতের শুভাগমনে এদেশের মাটি ও মানুষের মাঝে নূরের পরশ বিকশিত হয়নি। এমনকি কুদরতে সানীয়ার খলীফাতুল মসীহ্র কোন খলীফার আপন মসনদ থেকে বাংলার মাটিতে পদার্পণে অদ্যবধি ঐশী শান্তির ছোঁয়ায় সিক্ত হয়নি এদেশ ও বাঙালি জাতি। এটি বাঙালি জাতির জন্য বেদনাময় ঘটনা। বাঙালিদের জন্য দুর্ভাগ্যের নিদর্শন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) চল্লিশ দশকের মাঝামাঝিতে এদেশে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে তাঁর শুভাগমনের আশায় বকশী বাজার দারুত তবলীগে একটি নতুন ঘর তৈরী করা হয়। সার্বিক প্রস্তুতি নেয়া হয়। কিন্তু ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় দারুত তবলীগ আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হয়। দেশে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করে। ফলে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে বঙ্গভূমিতে যুগ ইমামের পদধূলি পরে নি। তাঁর চরণধূলিতে বাংলার মাটিতে রূহানীয়তের অম্লকানন সৃষ্টি হয়নি। এটা বাঙালি জাতির অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার প্রতিফলন। তাই ১৯৬৫ সালে তাঁর ওফাতের পর চীফ মুসলিম মিশনারী ইনচার্জ আমেরিকা আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে তা পত্রস্থ হলো ঃ

বাংলার আহমদী ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে

এক প্রবাসী আহমদীর নিবেদন

হায়! আমাদের প্রিয়তম নেতা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আজ ইহজগত হতে অন্তর্ধান করে গেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি বাংলায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাংলার আহমদীগণ তাঁকে আপন দেশে আনবার বন্দোবস্ত করতে পারল না, তাই বঙ্গভূমি এই মহাপুরুষের পবিত্র পদধূলির স্পর্শ হতে এবং বাংলার আহমদীগণ তাঁকে আপন দেশে নেয়ার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত রইল। এটা বাস্তবিকই বড়ই হৃদয় বিদারক। যা হউক, এর এক কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত রয়েছে, তা এই যে, বাংলার আহমদীগণ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) প্রবর্তিত ইসলাম সেবার প্রোগ্রামকে কেবল বাংলায় নয় বরং বহির্জগতেও যেন সফলকাম করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং জানমাল তজ্জন্য উৎসর্গ করেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের বাংলার ভাইবোনদের এই কাফ্ফারা পেশ করবার তৌফিক দিন,

এবং আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন এবং ইসলামের খেদমত ও তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কুরবানী দ্বারা এর প্রায়শ্চিত্ত করবার তৌফিক আমাদেরকে দিন। আমাদের ইসলাম সেবা এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ দেখে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রূহ স্বর্গে আনন্দিত হউক এবং বাংলার ওপর আশিস বর্ষণ করুক। তাঁর দেহ বাংলায় আসতে পারল না ; কিন্তু তাঁর আদর্শ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক।

(আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি চীফ

মুসলিম মিশনারী ইনচার্জ, আমেরিকা)
[পাক্ষিক আহমদী ১৫-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬]

তবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বাঙলার মাটিতে পদধূলি না পরলেও বঙ্গভূমি ও বাঙালিদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। তাই তিনি বঙ্গীয় আহমদীদের প্রতি ১৯২৫ সালে এক ঐতিহাসিক অমর বাণী প্রদান করেন। সেই অবিনাশী বাণীটি নিম্নরূপ ঃ

বঙ্গীয় আহমদীয়া জামা'তের প্রতি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর একটি

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বাণী

বঙ্গীয় আহমদী জামা'তের ভ্রাতৃবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম। গত বছর এবং এ বছরও আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও হিব্বি ফিল্লাহ্ (প্রিয় বন্ধু) চৌধুরী আবুল হাসেম খাঁ সাহেব এম, এ, আমার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যে, আমি যেন আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ পত্র প্রেরণ করি, যার মধ্যে আপনাদেরকে আপনাদের কর্তব্য সমূহের সম্পাদনের আত্মনিয়োগের প্রতি এবং আপনাদের আত্মসংস্কারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমার উক্ত ভ্রাতার এই আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত নেক এবং বাবরকত ছিল। এজন্য আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে আমি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার চেষ্টা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহুবার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও গত বছর এমন কতক ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয় যে এ ইচ্ছাটিও পূর্ণ করবার সুযোগ পেয়ে উঠেনি। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার সকল প্রশংসা যে, আজ আমি সে ওয়াদা যা আমি চৌধুরী সাহেবের নিকট করেছিলাম এবং সে ইচ্ছা ও সংকল্প যা আমি গ্রহণ করেছিলাম, পূর্ণ করার তৌফিক পাচ্ছি।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমি এই মত বার বার প্রকাশ করছি যে, আমার বিবেচনায় বাংলাদেশ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচারের জন্য দুনিয়ার উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে একটি। আমি দেখতে পাই যে, আপনাদের দেশের ওপর আল্লাহ্ তাআলার এমনই কৃপা যে, আপনাদের দেশের মানুষ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির এবং সত্যকে কবুল করার জন্য সম্ভবত: আগ্রহী। এবং এ সরলতার সঙ্গে তাদের মন ও মস্তিষ্ক জ্ঞান ও তত্ত্বকে আহরণ ও আয়ত্ত করার যোগ্যতা রাখে। যে জাতির মধ্যে উক্ত দুটি গুণ সন্নিবেশিত হয় তাঁদের সৌভাগ্য ও সফলতা এক প্রকার সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।

আমি যখন দেখি, পাঞ্জাবের পরে যে দেশে ইসলাম সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল আপনাদেরই দেশ, তখন আমার নিজের এই ধারণার সত্যতা ও যথার্থতার বাগান আরও প্রস্ফুটিত হয়। কেননা অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার পরে কোন বিষয়ের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে ?

উল্লেখিত বিষয়াবলীর প্রেক্ষিতে **বাংলাদেশের মানুষের প্রতি সর্বদাই আমার এক বিশেষ অনুরাগ ও ভালবাসা রয়েছে।** এবং যদিও আমার কর্তব্যাবলী আমার সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন জীবন নির্বাহে বাধ্য করে এবং এটাই ন্যায়নীতি সম্মত সঠিক ব্যাপার, কিন্তু আমার স্বভাবজাত প্রবণতা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী আমি বাংলার মানুষকে অপারগ অনেক দেশের ওপর অগ্রগণ্য করি এবং বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা হলে এ দেশ হতে ইসলাম ও আহমদীয়ত অনেক সাহায্য ও সমর্থন লাভ করবে। হিন্দুস্থানের দুটি প্রদেশ সিন্ধুদশ এবং বাংলাদেশের দিক হতে আমি সেই সৌরভ অনুভব করছি যা হযরত রসূল করীম (সা.) এর যুগে ইয়মেনের দিক হতে এসেছিল। এবং আমি আমার এই ধারণা অনুযায়ী আপনাদের চেষ্টা চরিত্র প্রত্যক্ষ করতে চাই। কেননা মানুষ কোন জিনিস সম্পর্কে তার নিজ ধারণা ও আশানুরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

ভাইয়েরা আমার! আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের ওপর অত্যন্ত গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত করেছেন। হেদায়াত কবুল করা এত কঠিন বিষয় নয় যতটুকু এটাকে সংরক্ষণ করা এবং এর কদর করা কঠিন হয়ে থাকে। আপনারা কি দেখেন না যে, চক্ষু, নাসিকা ও জিহ্বা লাভ করার জন্য মানুষকে কোন পরিশ্রম বা চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু দুনিয়াতে এমন অন্ধ অল্প সংখ্যক পাওয়া যাবে, যাদের জন্ম হতে চক্ষু দেয়া হয় না কিন্তু এরূপ অন্ধ সংখ্যায় অনেক পাওয়া যাবে যারা তাদের চক্ষুর রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। এবং তাদের চাইতেও অধিক সংখ্যক এমন অন্ধ ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যারা চক্ষুর কদর করে নাই এবং চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্ধদের শামিল। সুতরাং হে বন্ধুগণ! যখন আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে চক্ষু দান করেছেন এবং হেদায়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন, তখন সেই হেদায়াতের সংরক্ষণ করুন। এবং এটাকে ব্যর্থতার ও বিনাশের কবল হতে রক্ষা করুন। হে বন্ধুগণ! হেদায়াত খোদা তাআলার তরফ থেকে আসে এবং যদি আমরা নিজেরা আমাদের চক্ষু বুজে না নেই তাহলে উহা গ্রহণ করা মোটেই দুষ্কর নয়।

হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত নবী করীম (সা.) এর সময়ে এবং আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সময়ে খোলা চোখে হেদায়াত অবলোকন

করেন এবং এটা গ্রহণে তাদের এক মহূর্তও বিলম্ব হয় না। হযরত উমর (রা.) যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন করীম শ্রবণে বঞ্চিত ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্তই ইসলামের মোকাবেলা করেছেন, কিন্তু একদিন হঠাৎ যখন কুরআন করীমের বাণী তাঁর কানে বাঁজে তৎক্ষণাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ।সুতরাং মুসলমান হওয়া তথা হেদায়েত কবুল করা কোন সাধনা প্রসূত নহে। এটাত বিনা কর্মেরই ফলস্বরূপ ঃ কোন কর্ম ফল নয়। যদি আমরা নিজেরা অন্তরলোকের প্রবেশদ্বারসমূহ রুদ্ধ না করি তা হলে হেদায়াত আমরা পেয়ে যাই! যেমন সূর্যের আলো আমরা নিজের গৃহদ্বার রুদ্ধ না করলে আপনি আপনি আমাদের গৃহে প্রবেশ করে। যদ্বারা মু'মিন পরস্পর পরিচিত হয়, অথবা কাফেরের মোকাবেলায় মু'মিনের পার্থক্য ও বিশেষত্ব বুঝা যায়। সেই প্রকৃত কাজ হল লব্ধ হেদায়াতের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান তথা স্বীয় জীবনে এর যথার্থ প্রয়োগ ও রূপায়ন। এবং এই সেই কাজ যার জন্য আমাদের যথার্থ শক্তি ও সাধনা অবলম্বন করতে হয় এবং যার মধ্য দিয়ে আমাদের সাহস ও বিচক্ষণতা আমাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং আমাদের নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরীক্ষা হয়ে থাকে। যদি এই কাজে আমরা সফলকাম হই, তাহলে বলতে পারি যে, একটা কিছু সাধনা করলাম এবং এর জন্য আমরা খোদা তাআলার নিকট পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হতে পারি। নতুবা সূর্যকে সূর্য বলে দিলে মানুষের পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয় না। সুতরাং হে ভ্রাতাগণ! নিজেদেরকে আপনারা সত্যিকার খাঁটি ও পাকা মু'মিন এবং আহমদী বানাবার চেষ্টা করুন, যাতে আপনাদের ঈমান আপনাদের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয় এবং আপনাদের গৃহকে ইহজগতেই জান্নাতে পরিণত করে। আপনাদের উচিত, নিজ অন্তরকে শৈথিল্য ও আলস্যের প্রকোপ থেকে রক্ষা করা এবং কাপুরুষতা ও কপটতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা এবং অজ্ঞানতার মৃত্যু হতে বাঁচার প্রয়াস পাওয়া। জ্ঞান সুধা পান করুন এবং ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের ধনভান্ডার একত্র করুন যে ঐশী তত্ত্বজ্ঞ (আরেফ) নহে, সে বস্তুত এমন এক পঁচা গলা মৃতশব বিশেষ যে নিজের কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে না এবং অন্যদেরও স্বাস্থ্য বিকাশের কারণ হতে পারে না।

হে ভ্রাতাগণ! আপনাদের উচিত আপনাদের রসনাকে মিথ্যা ভাষণ, দোষারূপ, কু-সমালোচনা, ছিদ্রান্বেষণ কুবাক্য পরনিন্দা ও ঘৃণাবাচক কটূক্তি এবং অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ থেকে পবিত্র করা। এবং সত্য ভাষণের স্বভাব অর্জন করুন ও মানুষের দোষ গণনার চাইতে সদগুণ বলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করুন এবং ঘৃণার পরিবর্তে সসম্মানে আপন ভ্রাতাদের নাম উচ্চারণ করুন, বরং যারা আপনাদের শত্রু তাদের নামও। কেননা প্রীতি ও ভালবাসার তরবারী যা অর্জন করতে পারে, তা শত্রুতা করতে পারে না। তোমরা শত্রুতাকে শত্রুতার দ্বারা নহে, বরং প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা বিলুপ্তি করতে সক্ষম হবে।

এটাও উচিত যে, আপনারা যেন মানুষের সাথে আপনাদের লেন-দেনের ব্যাপারে সঠিক হিসাব করেন। আপনাদের সকল ব্যবহার ও আচরণ সুষ্ঠু ও সুমধুর করুন। আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ যেন আপনাদের চারিত্রিক বিশেষত্ব হয়, দীন-দরিদ্রের সাহায্য করা, অনাথ ও বিধবাদের খোঁজখবর রাখা এবং রোগীদের সেবা সুশ্রুষা করা যেন আপনাদের জীবন ধারায় পরিণত হয় এবং আপনাদের আচার ব্যবহার যেন এত মার্জিত ও ত্রুটিহীন হয় যে, শত্রুও যেন স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আহমদীয়ত মানুষের আমুল পরিবর্তন সাধন করে থাকে। এটা পশুবৎ ব্যক্তিকে গ্রহণ করে সত্যিকার মানুষে রূপান্তরিত করে। এটা হল ঈমানের হেফাযত বা সংরক্ষণের বিষয় যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দ্বিতীয় বিষয় হল, ঈমানের কদর করা বা মর্যাদা দেয়া, এটাও প্রথমটির চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেন,

অর্থাৎ "খোদা তাআলার তরফ থেকে তোমরা যে নেয়ামত প্রাপ্ত হও, তাকে প্রকাশ কর তথা তার সম্প্রসারণ কর।" তেমনিভাবে তিনি আরো বলেন, যদি তোমরা আমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা পোষণ কর তাহলে আমি তোমাদের ওপর আরও নেয়ামত বর্ষণ করব, কিন্তু "যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তা হলে আমরা শুধু সেই নিয়ামতই তোমাদের নিকট হতে ছিনিয়ে নেব না, বরং তোমাদের ওপর আযাবও প্রেরণ করব।" খোদা প্রদত্ত হেদায়াত বস্তুত নেয়ামতসমূহের অন্যতম। সুতরাং এর আবেদন এই যে, আমরা যেন সেই হেদায়াতকে অন্যান্যদের নিকট পৌঁছাই।

আপনারা অবশ্য আহমদীয়তের তবলীগ বা প্রচারের চেষ্টা করে থাকেন এবং মানুষের নিকট আল্লাহ্ তাআলার পয়গাম পৌঁছে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, আপনারা কি এ কাজ যে পর্যায়ে বা পরিমাণে সম্পাদন করেছেন যাকে খোদা তাআলার নেয়ামতের কদর বলে অবিহিত করা যেতে পারে? এবং আপনাদের এই চেষ্টা ও পরিশ্রম কি আপনাদের দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত? যদি এর জবাব না সূচক হয়, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, আপনারা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের যথোপযুক্ত কদর করেন নাই।

প্রিয় বন্ধুগণ! আজ পনর বছর থেকেও অধিককাল অতিবাহিত হল, বাংলাদেশে আহমদী জামা'ত কায়েম হয়েছে। কিন্তু এটা সত্ত্বেও এই সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত ছয় কোটি মানুষের অধ্যুষিত দেশে এখন পর্যন্ত আহমদীদের সংখ্যা হচ্ছে সর্বমোট মাত্র দুই তিন হাজার। তদুপরি এটা হতে অধিকতর আশ্চর্যজনক বিষয় হল এই যে, এই স্বল্প সংখ্যক আহমদীও কয়েকটি

স্থানের মধ্যেই সীমিত। শত শত মাইলব্যাপী অঞ্চল সম্পূর্ণ আহমদীয়ত শূন্য। তথায় এখন পর্যন্ত বীজও বপিত হয়নি, যার সম্বন্ধে আশা করা যেত যে, এর অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত ও পরিবর্ধিত হবে। যখন বাংলাদেশের এহেন অবস্থা, তখন আপনারা কিভাবে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, আপনারা আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন? যখন একদিকে সুস্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, হৃদয়গুলি হেদায়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আর অন্যদিকে আহমদীয়তের উন্নতির গতিধারা সম্পূর্ণ মন্থর ও নিস্তেজ, বরং না থাকার নামান্তর, তখন এটা স্বীকার করতেই হবে যে, চেষ্টায় ত্রুটি আছে এবং তা অত্যন্ত প্রকট। এর অপনোদন যথা শীঘ্র অত্যাবশ্যক।

সুতরাং এ অবস্থাবলীর প্রেক্ষিতে আমি আপনাদেরকে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, বাংলাদেশের জেলাগুলির দিকে সমষ্টিগতভাবে নজর দিন এবং যে অঞ্চলগুলিতে আহমদীয়ত বিস্তার লাভ করে নাই, সেগুলিকে ধরুন এবং সেসব স্থানে তবলীগের জন্য প্রচেষ্টা চালনা করুন। আপনারা সংখ্যায় স্বল্প। আর্থিক অবস্থাও ক্ষীণ। কিন্তু প্রত্যেক 'খোদাই জামা'ত' প্রারম্ভে এরূপই অল্পসংখ্যক ও দুর্বল রয়েছে। বরং ইহা অপেক্ষাও দুর্বল। সুতরাং দুর্বলতার প্রতি তাকাইও না। আর নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতার জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হইও না। এখলাস ও ঈমান, নিষ্ঠা ও প্রত্যয় এবং পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কুরবানী, আত্মোৎসর্গ এবং সাধনা করার অভ্যাস করুন। তা সংখ্যা-স্বল্পতা এবং অর্থ ও উপকরণগত দুর্বলতা উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতার কারণ হবে না, বরং কৃতকার্যতা ও বিজয় তোমাদের সহযাত্রী হবে এবং স্বল্প দিনের মধ্যে তোমরা তোমাদের দেশের নকশা পরিবর্তিত আকারে দেখতে পাবে।'

যদি আপনারা আপনাদের দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজের দিকে এবং জামা'তের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংশোধন এবং জ্ঞানগত উন্নতি সাধনের দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, তাহলে আমিও আপনাদের নিকট ওয়াদা করছি যে, আমি আপনাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা সফলতা ও ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য দোয়া করব এবং ইনশাআল্লাহ্ ক্রমাগতভাবে করতে থাকব।

আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথসমূহে চলবার তৌফিক দান করুন এবং আপনাদেরকে সাহস ও উদ্যম এবং শক্তি ও সামর্থ প্রদান করুন, যেন সত্যকে সারা বিশ্বে ছড়াতে পারেন। সঠিক পথ ও ধারা তিনি আপনাদেরকে প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের কথা ও কলমে এবং মন ও মস্তিষ্কে আশীষ ও বরকত দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।

মীর্যা মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী
(পাক্ষিক আহমদী ১৯৭২)

উপরন্তু বাঙালিদের দীল জয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি ইলহাম আছে। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত ঐশীবাণীর সেই অমর ইলহামটি হল–বাংলা সম্বন্ধে প্রথম যে আদেশ জারি করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে (তাজকেরা পৃঃ ৫৩৯)। ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকারের দিল্লীর গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের আদেশ জারি করা হলে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিদের মনে অনেক কষ্টের কারণ হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর আঘাত আসে। ফলে এ আদেশকে প্রতিহত করতে বঙ্গদেশে আন্দোলন গড়ে উঠে। বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালেই মাতৃভূমি বঙ্গদেশের মাটি মানুষ ও আলো বাতাস এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহে আবেগাপ্লুত হয়ে রচনা করেন তাঁর অবিনাশী গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এতে তিনি ব্যক্ত করেছেন বঙ্গদেশের প্রতি তার হৃদয়ের আকুতি। যা আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু আন্দোলনের শুরুতেই বৃটিশ সরকার বাঙালিদের ওপর নানা ভাবে স্ট্রীম রোলার চালায়, প্রতিহত করতে বিভিন্ন শাস্তি প্রয়োগ করে। আদেশকে বাস্তবায়নে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করা হয়। তখন দিল্লীর গভর্ণরের নামে ঢাকায় নির্মিত হয় কার্জন হল, যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শিক্ষা ভবন। চালু করা হয় বঙ্গভঙ্গের কার্যক্রম। অতঃপর বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্ণর ফুলার নিজ দায়িত্ব হতে হঠাৎ ইস্তফা দিলে বাঙালিদের মনে কিছুটা স্বস্তি আসে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৭ সালে বলেন, এ আদেশ বাঙালিদের মনে এতখানি মনঃকষ্টের কারণ হয়ে ছিল, যেন তাদের গৃহে শোকের ছায়া নেমে আসে। তারা বাংলার বিভক্তিকরণকে বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। বরং এর বিপরীত ফল এই দাঁড়ায় যে সরকারের কর্মকর্তারা তাদের আন্দোলনকে পছন্দ করল না। কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এখানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিশেষভাবে লেফটেনেন্ট গভর্ণর ফুলারকে তারা নিজেদের জন্য মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা মনে করল। কিন্তু এরূপ ঘটল যে, ঐ সময় যখন বাঙালিরা নিজেদের শাসকদের হাতে কষ্ট পাচ্ছিল এবং স্যার ফুলারের ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। তখন আমার নিকট উক্ত ইলহাম হল। অর্থাৎ বাংলা সম্বন্ধে প্রথম যে আদেশ জারি করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে। বস্তুতঃ আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময়ই প্রকাশ করি (হাকীকাতুল ওহী বঙ্গানুবাদ পৃঃ ২৪৯-২৫০)।

(চলবে)

(সম্পাদকীয়-র অবশিষ্টাংশ)

পত্র-পত্রিকা থেকে যা জানা যায়, এই কয়েক দিনে গাজায় এক হাজারেরও বেশি নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে আর এতে নিহত শিশুর সংখ্যা প্রায় তিন'শ। এছাড়া গত কয়েক দিনে গাজায় ফসফরাস বোমাসহ এমন সব ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক। গত মঙ্গলবারও (১৩/০১/০৯) ইসরায়েলি সৈন্যরা গাজায় কমপক্ষে ৬০টি স্থানে বিমান হামলা চালিয়েছে, আর এতে গাজা আবারও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে । এদিনে প্রায় ৭০জন নিহত হয়েছে। গাজার ভেতরে ঘনবসতি এলাকাগুলোয়ও ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলি ট্যাংক। হেলিকপ্টার গানশিপ আর নৌবাহিনীর সহায়তায় ইসরাইলি সেনাদের অভিযান দিনের পর দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। হোয়াইট ফসফরাসের আঘাতে দগ্ধ হচ্ছে গাজার অধিবাসীরা।

যুগ খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) সম্প্রতি জুমুআর খুতবাগুলোতে ইসরায়েলি বর্বর হামলার প্রতিবাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আজ যখন ফিলিস্তিনের ওপর নৃশংস হামলা করছে এমন নাজুক পরিস্থিতিতেও মুসলমান দেশগুলো সমবেতভাবে ও সমস্বরে কোন জোরালো প্রতিবাদ করতে পারেনি। খুবই ক্ষীণকণ্ঠে দু'একটি স্থানে প্রতিবাদ দেখা গেলেও এদের চেয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন খ্রিষ্টান সংগঠন এবং ব্যক্তির প্রতিবাদই যেন এরূপ বর্বর ইসরায়েলি আক্রমণের বিরুদ্ধে বেশি জোরালো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মুসলমানদের চেতনা লোপ পেয়েছে। তাই আমি পুনরায় দোয়ার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি আর এটিই আমাদের একমাত্র অস্ত্র।

আর কত দিন এভাবে শত শত নিরীহ মানুষের প্রাণ দিতে হবে? বিশ্বের কি কিছুই করার নেই? মনে হয় উভয় দেশের অতি দ্রুত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত, যাতে আর একজন নিরীহ মানুষও প্রাণ না হারায়। খোদা তাআলা অত্যাচারীকে অবশ্যই এর শাস্তি দিবেন। আজ ফিলিস্তিনিদের জন্য আমাদের যদি কিছু করার থাকে তাহলে উচিত হবে মহান খোদার দরবারে বিনীত ভাবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। একমাত্র তিনিই পারেন সে দেশে দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনতে। আর বিশ্বের আন্যান্য দেশগুলোরও যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, ইসরায়েলিদের এই বর্বর হামলার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিছু একটা করার।

সার্কুলার

মোহতারম আমীর/প্রেসিডেন্ট

মুরব্বী সিলসিলাহ্/ মুবাশ্বের মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান

বিষয় ঃ তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের (১লা নভেম্বর ২০০৮-৩১ অক্টোবর ২০০৯) ওয়াদার তালিকা তৈরী ও আদায় প্রসঙ্গে

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আল্লাহ্র ফযলে ভাল আছেন। হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ৭ নভেম্বর ২০০৮ তারিখ ব্রেডফোর্ড, লন্ডনে নব নির্মিত মসজিদে জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ৭৫তম নতুন বছরের ঘোষণা দিয়েছেন এবং মালী কুরবানীর গুরুত্বের ওপর বিশেষ আলোকপাত করেন। আপনার কাছে অনুরোধ রইল যে, অতিসত্ত্বর তাহরীকে জাদীদের ওয়াদার তালিকা তৈরী করে কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি ঃ

১। নতুন বছরের তালিকা তৈরীর কাজ সম্পূর্ণরূপে আরম্ভ করবেন। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী /২০০৯ এর মধ্যে দফতর অনুযায়ী (অর্থাৎ ১ম দফতর ঃ ১৯৩৪-১৯৪৪ ইং, ২য় দফতর ঃ ১৯৪৪-১৯৬৫ ইং, ৩য় দফতর ঃ ১৯৬৫-১৯৮৫, ৪র্থ দফতর ঃ ১৯৮৫-২০০৪ ইং, ৫ম দফতর, ২০০৪-হতে চলবে) তালিকা তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে পাঠানোর জন্য সাবনিয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

২। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে বাজেটে ওয়াদার পরিমাণ গত বছরের চেয়ে বেশী হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

৩। ওয়াদা আদায়ের লক্ষ্যে বছরে কমপক্ষে দু'টি তাহরিকে জাদীদ সপ্তাহ পালন করবেন ।

৪। জামা'তের সকল আতফাল, আনসার, খোদ্দাম, লাজনা এবং নাসেরাত সদস্যকে তাহরীকে জাদীদের অর্থ ব্যবস্থায় (মালী নিযামে) শামিল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলের হাফেয নাসের ও হাদী হউন, আমীন।

শহীদুল ইসলাম বাবুল

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

জামা'ত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

মানবতার সেবায় গাজীপুর জামা'তে শীত বস্ত্র বিতরণ

১৬ই ডিসেম্বর সন্ধার পর গাজীপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মহিবুর রহমান সাহেবের উপস্থিতিতে দোয়ার মাধ্যমে গরীব আহমদী ও আশ-পাশ সহ রেলওয়ে বস্তিতে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য শীত বস্ত্রগুলি খোদ্দামও আনসারদের সহযোগিতায় বিভিন্ন আহমদী পরিবারের কাছ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করে মসজিদে একত্রিত করা হয়। উক্ত জনকল্যাণমূলক কাজে খোদ্দাম ও আনসারসহ প্রায় ১০ জন অংশ গ্রহণ করেন।

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন

গত ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস অত্যন্ত সফলতার সাথে গাজীপুর জামা'তের উদ্যোগে উদযাপিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মহিবুর রহমান। পরে উক্ত দিবসের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় "মুক্তিযুদ্ধ ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর ভূমিকা" এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মহিবুর রহমান সাহেব। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে উক্ত সভার সমাপ্তি হয়। সভার শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয় এর মধ্যে কুইজ, পয়গামে রেসানী ও দ্বীনি মা'লুমাতের ওপরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও আতফালদের মাঝে চকলেট বিতরণ করা হয়। উক্ত দিবসে খোদ্দাম, আতফাল, আনসারসহ প্রায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কবির আহমদ জি, এস

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গাজীপুর

শোক সংবাদ

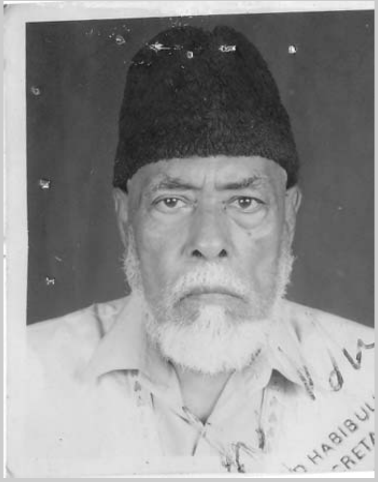

অত্যন্ত দু:খের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর সিলেটের বিখ্যাত মাওলানা মমতাজ আহমদ সাহেবের সুযোগ্য এক পুত্র মাওলানা ফারুক আহমদ শাহেদ সাহেব দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ২১/১২/২০০৮ তারিখ রোজ রবিবার নিজ বাসভবন বি. বাড়ীয়ার ঘাটুরাতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর। তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। আহমদীয়াতের সেবায় একজন উৎসর্গ প্রাণ মাওলানা ফারুক সাহেব সফলতার সাথে বিভিন্ন জামা'তের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে আসার পর তার পোষ্টিং হয় চট্টগ্রামে। এ ছাড়া তিনি মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসাবে দেশের বিভিন্ন জামা'তে ঈর্ষনীয় উদ্যমের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এক সময় বি,বড়িয়া জামা'তের আমীরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এক কথায় তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। মৃত্যুকালে তিনি বিবি, ৩ ছেলে ও ৬ মেয়ে সহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ঘাটুরা জামা'তে মরহুমের জানাযা শেষে তাঁর পৈত্রিক বাড়ী হবিগঞ্জের বরগাঁও নিয়ে যাওয়া হয় এবং দ্বিতীয় জানাযা শেষে দাফন করা হয়। মরহুমের আত্মার মাগফেরাত এবং তাঁর রেখে যাওয়া পরিবার বর্গের সকল সদস্যসদস্যাগণকে আল্লাহ্ তাআলা যেন সাব্‌রে জামিল দান করেন সেজন্য জামা'তের সকল ভাইবোনদের নিকট বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে।

–সম্পাদক

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ০৩/০১/০৯ইং রোজ শনিবার বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। বনভোজনে লাজনা ও নাসেরাত মোট ৬৫ জন অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯টায় দোয়ার মাধ্যমে বনভোজনের কার্যক্রম শুরু হয়। দুপুরে নামায যোহর ও আসর আদায় করার পর খাবারের আয়োজন করা হয়। খাবারের পর লাজনা ও নাসেরাত বোনদের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন মোহতারমা দিলরুবা বেগম মায়া। প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। দোয়ার মাধ্যমে বনভোজনের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ-এ আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান উদযাপিত

খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন, স্থানীয় আমীর সাহেব ও র‍্যালির দৃশ্য

বিগত ২৭মে ০৮ইং রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী (১৯০৮-২০০৮) উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান কর্মসূচীর অন্যতম বিষয় সমূহের মধ্যে ছিল রাত ৩.৩০ মিনিটে মসজিদে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়। তাহাজ্জুদ নামাযে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন। বাদ ফযর ইজতেমায়ী দোয়া ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। জুবিলী অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশ হিসেবে মসজিদ থেকে র‍্যালি সহকারে প্রায় ১ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে মুসীয়ানদের কবরস্থান জিয়ারত ও দোয়া করা হয়। এতে জামা'তের প্রায় ২ শতাধিক পুরুষ, মহিলা, ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর জামা'তের পক্ষ থেকে ২টি খাসি সদকা করা হয়। আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর অংশ হিসেবে আহমদীগণ নন-আহমদী বন্ধুদের উপহার হিসেবে বিভিন্ন তবলীগি পুস্তক সহ ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। অতঃপর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্থানীয় আমীর মোহতারম এ্যাডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসা অনুষ্ঠান পবিত্র কুরআন, নযম এবং খিলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ জ্ঞান গর্ব আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ-এর সদস্য ছাড়াও পার্শ্ববর্তী মুন্সিগঞ্জ জামা'ত, রিকাবী বাজার জামা'তের সদস্যবৃন্দ, একজন পৌর মহিলা কমিশনার, বিভিন্ন গণ্যমান্য আমন্ত্রিত অতিথি সহ প্রায় ৪ শতাধিক দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর উপস্থিত দর্শক শ্রোতা বৃন্দ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এমটিএ-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফত শতবার্ষিকী (১৯০৮-২০০৮) উদযাপন উপলক্ষে লন্ডন হতে সরাসরি প্রদত্ত ভাষণ গভীর আগ্রহে সকলে উপভোগ করেন। আরো উল্লেখ্য যে, আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর অনুষ্ঠানের যে সমস্ত কার্যক্রম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রতিপালিত হয়েছে স্থানীয় ৪টি দৈনিক পত্রিকায় তার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

রফি উদ্দিন আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ এর প্রাক্তন সদর মোহতারমা মাসুদা সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেবার স্মরণে নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্ এর উদ্যোগে যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত

বিগত১৯-১২-২০০৮ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ এর প্রাক্তন সদর মোহতারমা মরহুমা মাসুদা সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেবার স্মরণে এক যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোহতারমা সাজেদা রশিদ, মোহতারমা আবেদা চৌধুরী প্রমুখ বক্তাগণ মোহতারমা মরহুমা মাসুদা সামাদ খান চৌধুরী সাহেবার জীবনের বিভিন্ন গুণাবলীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আলোকপাত করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করে আহমদীয়াত ও লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রতি তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। উল্লেখ্য যে, মোহতারমা মরহুমা মাসুদা সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেবা সুদীর্ঘকাল লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বভার পালন করেন।

সভাপতির ভাষণে স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতারমা দিলরুবা বেগম মায়া, মরহুমার পরলোক গমনে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং মরহুমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে মরহুম মৌলবী সলিমুল্লাহ্ সাহেবের নাতি ঘাটুরা জামা'তের সদস্য জনাব এস এম মাসুম গত ১৮/১২/২০০৮ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫ টায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঘাটুরা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার একজন ভাল কর্মী ছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৩০ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুটি নাবালিকা কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। বাদ যোহর জানাযার নামাযের শেষে স্থানীয় সরকারী গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মরহুমের আত্মার মাগফেরাতসহ তাঁর রেখে যাওয়া পরিবার বর্গের সবাইকে যেন আল্লাহ্ তাআলা সবরে জামিল দান করেন সেজন্য জামা'তের সকল ভাই ও বোনদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরা

শুভ বিবাহ

• গত ১৩/১২/০৮ মোছাঃ ইউমনা বুশরা, পিতা-মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, গ্রাম+পোঃ রমজান বেগ, ভায়া মুন্সীগঞ্জ, জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ, বর্তমান ঠিকানা-ই-১/৬ মিরপুর পোষ্টাল কোয়ার্টার, ঢাকা-১২১৬ এর সাথে জনাব মাহবুবুর রহমান পিতা-জনাব হাবিবুর রহমান, Av. GEORGES TRUFFAUT 31 B.T.E 47. 4020 LIEGE, BELGIUM -এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্প্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৪৫/০৮

• গত ৮-১১-২০০৮ মোছাঃ শাপলা বেগম পিতা-মোহাম্মদ মিনু মিয়া, ফুলতলা, বোদা, পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ নাসির আহমদ পিতা-মৃত আব্দুস সামাদ, সিমরাইলকান্দি, পাওয়ার হাউজ রোড, বি. বাড়ীয়া এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৪৬/০৮

• গত ১৯-১২-২০০৮ মোসাঃ আতিয়াতুল হাই (জুঁই), পিতা- বাবুল আহমদ চৌধুরী, ১৯, চামেলী বাগ, ফ্লাট ৬/সি, ঢাকা এর সাথে মোহাম্মদ বশির উদ্দিন, পিতা-রবিউল হক, বাড়ী নং ৯, ব্লক-এ, লেন-১ সেকশন-১০, মিরপুর এর বিবাহ ২,০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৪৭/০৮

• গত ১৪-১১-২০০৮ মোছাঃ হোসনা হক, পিতা-মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রীতম ভিলা, ডি-৩২/১ আজিমউদ্দিন কলেজ রোড, জয়দেবপুর, গাজিপুর এর সাথে সিকদার নাসের আহমেদ, পিতা-এস, এম আনয়োরুল্লাহ্, আই-১২০/৫, উত্তর বিলাশপুর, জয়দেবপুর, গাজিপুর এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৪৮/০৮

• গত ১২-০৯-২০০৮ মোছাঃ মাকসুদা ইসলাম (নিলু), পিতা-মৃত হায়দার আলী, চরকুমারিয়া, পোঃ ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এর সাথে মোহাম্মদ নবাব আলী, পিতা-মোহাম্মদ হাকীম উদ্দিন, বানিয়াজান বারই পাড়া, বলদীহাট ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৪৯/০৮

• গত ১৯-০৯-২০০৮ মোছাঃ রুকসানা বেগম, পিতা-শেখ নজিবুর রহমান, মিরহাটি (ঘাটুরা) সুহিলপুর, বি, বাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মদ সোলমান মিয়া, পিতা-মোতাহার মিয়া, গৌতম পাড়া, ঘাটুরা এর বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৫০/০৮

৮৫তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ২০০৯

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, হুযূর (আই.) -এর সদয় অনুমোদনক্রমে আগামী ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী রোজ (শুক্র, শনি ও রবিবার) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসা ২০০৯ ঢাকার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ। জলসার সার্বিক সফলতার জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মীর মোহাম্মদ আলী

অফিসার জলসা সালানা

৮৫তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসা-২০০৯

এ পক্ষের কৃষি

১৬ জানুয়ারী হতে ৩১ জানুয়ারী

১লা মাঘ হতে ১৬ মাঘ

চাষী ভাই এ পক্ষে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করতে পারেন ঃ

১) বোরো চাষ ঃ এ পক্ষকালে বোরো চাষ রোপন ব্যপক ভাবে চলবে। চারা রোপনের পূর্বে জমি চাষ ও মই দিয়ে উত্তম রূপে প্রস্তুত করুন। শেষ চাষে সুষম মাত্রায় ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করুন। প্রয়োজনে খাকসার ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন। এ পক্ষকালে মাসকালাই, সরিষা কাটা পরবে। মাসকালাই এবং সরিষা কাটার পর বোরো চাষ করতে পারেন।

জৈবসার	২০০০ কেজি/একর
ইউরিয়া	৯৬ কেজি/একর
টি এস পি	৫০ কেজি/একর
এম ও পি	৩৬ কেজি/একর
জিপসাম	৩৪ কেজি/একর
দস্তা	২ কেজি/একর

চারার বয়স ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে রোপন শেষ করুন।

২) গম চাষ ঃ এ পক্ষকালে আগাম বপনকৃত খেতে ফুল আসবে। ফুল আসার পূর্বে জমির জোঁ বুঝে তৃতীয় সেচ দিন। সেচ দেয়ার সময় দৃষ্টি রাখবেন যাতে খেতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়। বিশেষ করে ফুল আসা অবস্থায় বলাবদ্ধতা হলে ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যাবে।

৩) ভুট্টা চাষ ঃ যে সকল খেতের ফসলের বয়স ৬০-৭০ দিনের হয়েছে সেসকল খেতে মাটির জোঁ বুঝে তৃতীয় সেচ দিন। যে সকল খেতের ফসলের বয়স ৮৫-৯৫ দিন হয়েছে সেসকল খেতে চতুর্থ সেচ দিন। মনে রাখবেন ঃ

* ভুট্টার ফুল ফোটা এবং দানা বাঁধার সময় জমিতে যাতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয় সেদিকে যত্নবান হবেন।

৪) কুমড়া চাষ ঃ

(ক) মিষ্টি কুমড়া ঃ মিষ্টি কুমড়া খেতের আগাছা পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে সেচ দিন। মৌমাছির আনাগোনা কম হলে কৃত্রিম উপায়ে পরাগয়ন করে দিন। সকালে সূর্য উঠার ১ ঘন্টার মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়ন করা উত্তম।

(খ) গেমী কুমড়া ঃ এ পক্ষকালে গেমী কুমড়ার চারা রোপন/ বীজ বপন কাজ শেষ করুন। বীজ বপন/ চারা রোপন পূর্বে মাদায় সুষম মাত্রায় জৈব সার সহ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করুন।

৫) ডাল ফসল ঃ (১) এ পক্ষকালে মাসকালাই ডাল কাটা শেষ হবে। ডাল ফসল তোলার সময় শিকড় সহ তুলবেন না। কাস্তে দিয়ে কেটে তুলবেন অথবা শুটি হাতে তুলে গাছ মাটিতে মিশিয়ে দিন। এর ফলে জমির উর্বরতা বাড়বে।

(২) অন্যান্য ডাল ফসলের অন্তরবর্তীকালীন পরিচর্যা করুন। খেত প্রতিদিন পরিদর্শন করুন। এপক্ষে কুয়াশা পড়বে, জাব পোকার আক্রমণ হবে। আক্রমণের প্রথম দিকে দমনের ব্যবস্থা নিন।

৬) সরিষা চাষ ঃ এপক্ষকাল থেকে সরিষা কাটা শুরু হবে। সরিষা গাছের নিচ থেকে শতকারা ৮০টি গুটি পাকলে সকালের দিকে সরিষা গাছ কাটুন। রোদ বেড়ে গেলে কাটা বন্ধ করে কাটা ফসল মাড়াই অঙ্গনে নিয়ে নিন এবং রৌদ্রে শুকান। কোন অবস্থাতে গুমানো যাবে না। গুমালে ফসলের মান নষ্ট হয়ে যাবে। তেলের পরিমাণ কমে যাবে।

৭) আখ চাষ ঃ যে সকল চাষী ভাই আগাম আখ চাষ করতে পারেন নাই সে সকল চাষী ভাই এ পক্ষকালে আখ চাষ করতে পারেন। আগাম চাষকৃত আখ খেতের পরিচর্যা করুন।

৮) চিনা বাদাম চাষ ঃ এপক্ষকালে অন্তরবর্তীকালিন পরিচর্যা করুন। আগাছা পরিষ্কার করুন। খেতের উপরের স্তরের মাটি আলগা করে দিন। চাষী ভাই, মনে রাখবেন গাছের ফুল ফোটার পূর্বেই গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে।

৯) কলা চাষ ঃ যে সকল চাষী ভাই কার্তিক মাসে কলার চাষ করতে পারেন নাই সে সকল চাষী ভাই এ পক্ষকালে কলার চাষ করতে পারেন।

১০) শীতকালীন সব্জি চাষ ঃ শীতকালীন সব্জির পরিচর্যা করুন। সঠিক সময়ে ফসল তুলুন এবং বাজারজাত করুন।

গ্রীষ্মকালীন সব্জি চাষ ঃ চাষী ভাই, এপক্ষকালে আগাম ঢেঁরস, বরবটি, ডাঁটার আবাদ করতে পারেন।

(ক) পিঁয়াজ চাষ ঃ পিঁয়াজ চাষের জমি এ পক্ষকালে নির্বাচন করে চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে রাখুন।

(খ) দক্ষিণ অঞ্চলে এ মৌসুমে মরিচ চাষ করা হয়ে থাকে। খেতের আগাছা পরিষ্কার করুন। গাছের গোড়া থেকে আলগা মাটি সরিয়ে দিন। কাছ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ কম হবে। খেতে কঞ্চি/ ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করে দিন। পাখি পোকা খেয়ে ফেলবে।

(গ) দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এপক্ষকালে সেচ সুবিধাযুক্ত উচু জমিতে বরবটি, ডাটা, ঢেঁরস, পুই শাক চাষ করতে পারেন। আগাম ফসল তুলতে পারলে ভাল বাজার দর পাবেন।

(ঘ) এপক্ষকালে শশা, চিচিংগা, চাল কুমড়া চাষ করার জন্য মাদা তৈরী করুন। মাদায় জৈব সার সহ সুষম মাত্রায় অন্যান্য সার প্রয়োগ করুন।

১২) গোল আলু ঃ আলু ফসল এখন বাড়ন্ত ফসল তাই প্রতিদিন খেত পরিদর্শন করুন। বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ২য় সেচ দিন। নালার ২/৩ অংশ ডুবিয়ে সেচ দিন। নালা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে সেচ দিলে গাছের কান্ড এবং পাতা ডুবে যাবে। জানুয়ারী মাসের শেষ পক্ষে জাব পোকার ব্যপক আক্রমণ হবে, জাব পোকা খেতের প্রচুর খতি করে থাকে। জাব পোকা দেখার সাথে সাথে দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এপক্ষকালে কুয়াশা পড়বে এরকম আবহাওয়ায় আলুর মড়ক রোগ লাগার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কুয়াশা পড়া শুরু হলে নির্ধারিত মাত্রায় ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করুন। প্রয়োজনে খাকসার /উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৯১৩৫২০৬৭২